তারা সাতজন

শিশির লাহিড়ী

সাহিত্য প্রকাশ
৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৫৯

প্রকাশক : দিলীপ মিত্র : ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : বিশ্বনাথ কবিরাজ : গঙ্গা মুদ্রণ

৫৪।১বি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট : কলিকাতা-৪

ছোটমাকে—

॥ আসা ॥

রিকসা থেকে নেমে বাবলু দরজার কড়া নাড়ল।

বাড়ির ভেতর পিসিমার গলা। পিসিমা বলছেন দেখ তো টুকুন বাইরে কে কড়া নাড়ছে।

দরজা খুলে টুকুন আশ্চর্য হয়ে গেল, আরে তুই!

বাবলু হেসে বলল, চলে এলুম।

টুকুন তক্ষুনি বাড়ির দিকে মুখ করে জোরে চিৎকার করল, মা বাবলু এসেছে।

পিসিমাব গলা আবার শোনা গেল সত্যি।

'সত্যি মা।'

জিনিসপত্র দাওয়ায় ওঠাতে ওঠাতে বাবলু পিসিমার ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সিঁড়ির ওপর তুপদাপ আওয়াজ হচছে। বাবলুর পিসিমা একটু মোটা। তা মোটা হলে কী হয় পিসিমা এখনও একা তুবেলা একশ লোকের রান্না রাঁধতে পারেন। শ'তুই লোককে পরিবেশন করে খাইয়ে দিতে পারেন। পিসিমাকে মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করে বাবলু, ভালবাসে। তাছাড়া বড় আদরযত্ন করেন পিসিমা। এটা খা, ওটা খা করে পাগল করে দেন। আগে গোকুলপিঠে কখনও খায়নি বাবলু। সেবার সেই বাবার সঙ্গে যখন এসেছিল তখন গোকুলপিঠে খেয়ে এমন খারাপ অভ্যাস হয়েছিল, যে একদিন ওটা না খেলেই মনে হত, খেয়ে পেটই ভরল না।

লাল পাড়ের শাড়ি পরণে পিসিমার কপালে জবাফুলের মত মস্ত একটা সিঁতুরের টিপ। গায়ে ভুরভুর চন্দনের গন্ধ। নিশ্চয়ই পিসিমা এতক্ষণ পূজোর ঘরে ছিলেন। মদন-গোপালের সামনে

ভোগ দেওয়া এক থালা ফল-মিষ্টির নৈবেদ্যের চেহারা বাবলুর চোখের সামনে ভেসে উঠল। আপেল, আঙুর, কমলা, কিসমিস, পেস্তা, বাদাম, গুঁজিয়া, সন্দেশ, চিনি, বাতাসা। বাবলু পিসিমাকে দেখে তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

বাঁহাতে বাবলুকে জড়িয়ে ধরে পিসিমা হাসি হাসি গলায় বলে উঠলেন 'ওমা! তুই কত বড় হয়ে গেছিস রে বাবলু!'

বাবলু একথার কী জবাব দেবে। মাথায় একটু ঢ্যাঙা হয়েছে সে। চুলগুলো একটু বড় বড়। চোখে চশমা নিয়ে বাবলুকে বেশ ভারিক্কী দেখায়। নইলে কী আর বয়েস বাবলুর। এইত তেরো ছাড়িয়ে চোদ্দয় পা দিতে এখনও মাস ছয়েক বাকি।

বাবলু জিজ্ঞাসা করল 'বাবার চিঠি এসেছে।'

'এসেছে। কিন্তু তাতে তো তুই আজ আসবি লেখেনি। তাহলে টুকুনকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিতাম। - বাড়ি চিনে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই।'

বাবলু হাসল তুমি কী যে বল পিসিমা! তোমার বাড়ি আসা খুব সহজ। হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ি চাপা, সকালে এখানে নামা। ষ্টেশন থেকে বাইরে এসে রিকসা চেপে বল ভিলোভাণ্ডেশ্বরের গলি। ব্যস—

টুকুন বলল 'অনেকে ভুল করে কাশী ষ্টেশনে নেমে পড়ে। তারপর ঘুরে মরো।'

আমাকে অত বোকা পাওনি। আমি জানি বেনারস ক্যান্টনমেন্ট-এ নামতে হবে।

'টুকুন' পিসিমা বললেন 'বাবলুর স্যুটকেশটা তুলে রাখ। বেডিংটা ছাতে রোদে দিয়ে দে।' তারপর বাবলুকে নিয়ে ওপরে উঠতে বললেন 'চল আগে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুখে কিছু দে তারপর কথা। আহারে! সেই কাল রাতে খেয়েছে ছেলেটা এখন বেলা আটটা বাজতে চলল।'

বাবলু মনে মনে হাসল। পিসিমার আবার সেই খাও খাও শুরু হয়েছে! বেশি খাওয়াদাওয়ার কথা বললে এখন বাবলুর লজ্জা করে। হাজার হোক বড় হয়েছে বাবলু আর দুটো ক্লাশ, তার পরেই বাবলু কলেজে পড়তে যাবে। তবু খাওয়ার কথায় বাবলুর ভালই লাগল। সত্যি পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো যেন হজম হয়ে গেছে।

অবশ্য মোগলসরাইয়ে চা সিঙাড়া খেয়েছে বাবলু। চা-টা ভাল লাগেনি। সিঙাড়াগুলো ভাল ছিল। কিন্তু বাইরের খাবার খেতে বারণ বলে মনের সুখে খেতে পারেনি বাবলু।—ও ছু একখানাতে ঠিক পেট ভরে না।

হাত-পা-মুখ ধুয়ে খেতে বসে গেল বাবলু। গরম গরম লুচি বড় বড় বেগুনের চাকা ভাজা। গত রাত্রের ক্ষীর ছিল তার সঙ্গে মদন-গোপালের প্রসাদ—গুজিয়া আর সন্দেশ। পাশেই টুকুনদা বসেছে। ফুলকো লুচির টুকরো ভেঙে মুখে পুরছে দুজনে আর হাসছে।

এই সময় পিসেমশায় এসে হাজির। বাজারের থলিটা নামিয়ে রেখে পিসেমশাই আশ্চর্য হয়ে তাকালেন, 'আরে কে ও! গ্রেট ডিটেকটিভ মাষ্টার বাবলু রায় নয়? তুমি কখন এলে হে ডিটেকটিভ?'

ডিটেকটিভ কথাটা গায়ে মাখল না বাবলু। পিসেমশাই মজা করে অমন অনেক কথা বলেন। কিন্তু একেবারে মজা করে বলা নয় এ ব্যাপারটায় একটু সত্যি আছে। নিতুর সেই মিষ্টি চুরি করে খাওয়া কেসটার কথা মনে পড়ল বাবলুর। বাবলুই সেটা ধরেছিল। ইংরেজি কায়দায় 'দি মিষ্টিরিয়াস সুইট মিট থেপ্ট অথবা মিষ্টি চুরি রহস্য' এই নাম দিয়ে বাবলু সেটা নিজের ডায়রিতে লিখে রেখেছে। এরকম আরও দু একটা ঘটনা ঘটেছে। এই ত মাসখানেক আগে বাবলু আর রজত দুই বন্ধু একটা লরি ধরেছিল। লরিটা ওপরে খড় বিছিয়ে নিচে দামী দামী যন্ত্র পাচার করছিল। পুলিশ

ইন্সপেকটরও বাবলুর পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, 'বাহ বেশ ছেলে! এরকম ছেলেই ত চাই! গুড বয়।'

বাবলু পিসেমশায়ের দিকে তাকিয়ে বলল। 'এই ত একটু আগে এলাম।' বেনারস একসপ্রেসে।

টুকুন হেসে উঠল 'বাবা বুড়ো-বুড়ির গাড়িতে এসেছে বাবলু।'

পিসেমশাই বললেন 'বুড়োবুড়ির গাড়ি! সে আবার কী?' বুড়োবুড়ির গাড়িতে। এহ।

বাবলু বলল 'আমি যে কামরায় এসেছি তাতে একজোড়া বুড়োবুড়ি ছিল। বাবাই খুঁজে খুঁজে ওদের বার করে আমাকে সেই গাড়িতে তুলে দিয়েছে।'

'ওমা! তাই বল।' পিসিমা কথা কয়ে উঠলেন 'আমি তখন থেকে ভাবছি মেজদা প্রাণে ধরে একা ছাড়ল কি করে?'

'তুমিও যেমন' বাবলু হাসল 'বাবা একা ছাড়বে! যা ভীতু না।'

পিসিমা ফোঁস করে উঠলেন 'বেশি পাকামি করতে হবে না। যা দিনকাল হয়েছে আজকাল! এই ত কদিন আগে বাঙালীটোলার গলি থেকে একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল আজ অবধি খোঁজ নেই তার। আহা! মা-টা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেল।'

বাবলু পিসিমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। ছেলেধরার কথায় হঠাৎ সেই দাড়িঅলা লোকটার কথা মনে পড়ে গেল তার। কাল রাতে ট্রেনে ঘুমের মধ্যে সেটা স্বপ্ন, না সত্যি সত্যিই, বাবলু কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারল না। তার মাথায় পাগড়ি, এক মুখ দাড়ি। কপালে বসন্তের দাগ, লোকটাকে বুলডগের মত দেখাচ্ছিল।

॥ লোকটা কে ॥

চানটান করে ভাত খেয়ে দুপুরবেলা শুয়ে ঘুমতে গিয়ে বাবলু আবার ভাবল, লোকটা কে?

সেই যে তখন আচমকা মনের মধ্যে চিন্তাটা ঢুকেছে এখনও সেটা তাড়াতে পারছে না বাবলু। টুকুনটার সঙ্গে দু-এক গেম ক্যারাম খেললে মনের এ ভাবটা কেটে যেত। হৈ হৈ করে সময়টা কাটিয়ে দিতে পারত বাবলু। কিন্তু পিসিমা এখন কিছুতেই শুনবেন না। বলবেন 'সারারাত ট্রেনে এলি এখন আর হুটোপাটি নয়। এখন ঘুম। তারপর বিকেল থেকে যা মন চায় করিস।' পিসিমা একবার বললে, সে কথা নড়চড় করা দুঃসাধ্য।

লোকটাকে প্রথম দেখেছিল কলকাতায় সেই লরি ধরার দিনে। পাড়ার মধ্যে দিয়ে লরিটা যাচছিল। তাতে ছিল অল্প খড়। ইংরাজি ইউ অক্ষরের মত ছোট গলি। লরিটা বড় রাস্তা ছেড়ে কেন যে এই ঘুর রাস্তা দিয়ে যাচছিল, কিছুতেই বুঝতে পারছিল না বাবলুরা।

লরিটাকে দেখেই কেমন যেন সন্দেহ হয়। অতটুকু খড় নিলে চাকার হাওয়া বসে যায় নাকি! আর রজত মজা করে বলেছিল, 'ড্রাইভারজী হাওয়া খুল গিয়া।'

ড্রাইভার কিন্তু ওদের কথায় কান না দিয়ে লরিটাকে জোরে চালাবার চেষ্টা করছিল। ছোট রাস্তা তার ওপর বিষম বাঁকা। রজত লাফিয়ে গাড়ির ওপর উঠেছে। মুখ বাড়িয়ে জোরে চিৎকার করছে 'ড্রাইভারজী হাওয়া খুল গিয়া।'

ড্রাইভার হঠাৎ রেগে খেঁকিয়ে উঠেছে। 'হাটো' বলে একটা গালাগাল দিয়েছে। তাইতে রাগ হয়ে গেছে বাবলু আর রজতের। ওরা চিৎকার করে লোক জড়ো করেছে। স্কুলের বড় ছেলেরা আসছিল পাড়ার দুচারজন বয়স্ক লোক। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপের মত হঠাৎ চোরাই মালের সন্ধান পাওয়া যায় তারপর পুলিশ।

যে লোকটা লরিটাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছিল তাকে অনেকটা ঐরকম দেখতে। মাথায় পাগড়ি, একমুখ দাড়ি, কপালে বসন্তের দাগ, গায়ে জোব্বা পরণে ডোরাকাটা রংচংয়ে লুঙ্গি। পায়ে ময়লা নোংরা নাগরা জুতো। গরুর পায়ের মত জুতোর তলায় বোধহয়

নাল লাগানো আছে। সব সময় খটখট শব্দ হচ্ছিল জুতোর। লোকটা খুব কটমট চোখে বাবলু আর রজতের দিকে তাকিয়ে ছিল। সুযোগ পেলে বোধ হয় লোকটা তাদের শেষ করে দিতে পারে এমনি মুখের চেহারা।

লোকটাকে কিন্তু ভুলে গিয়েছিল বাবলু। ওই প্রথম দিনই যা দেখা।

এদিকে সকলেই তাদের ধন্য ধন্য করেছিল। স্কুলের হেড-মাষ্টারমশাই পর্যন্ত দুজনকে ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিয়ে ওদের সাহসের প্রশংসা করেছিলেন।

বাবলুরা লজ্জা পেয়েছিল। প্রশংসা করার কিছুই নেই। কেননা যার একটু বুদ্ধি আছে সেই ওটা ধরতে পারত। কেউ ভাল বললে গুণগান করলে, শুনতে ভাল লাগে। কাজেই বাবলুরা। গলে গিয়েছিল। মস্ত একটা কিছু করে ফেলেছে, এমন একটা ভাব বাবলুদের। বাবলু ডাইরি খুলে দি হে স্ট্যাক অথবা খড়ের লরির রহস্য নাম দিয়ে ঘটনাটা লিখে রেখেছে।

যাই হোক কাশীর গাড়িতে দাদুদিদার সঙ্গে বেশ মজা করেই আসছিল বাবলু। দাদুদিদা একা একা ছিল বাবলুই হাত বাড়িয়ে দাদুর সিগারেট কিনেছে, দিদার জন্য পান। বেশ একটু মাতব্বরি মাতব্বরি ভাব। দিদাটাও বেশ মজার লোক। খুব গল্প করতে আর হাসতে পারে। ওদের খুব ভাল লাগছিল বাবলুর।

তারপর চিত্তরঞ্জন না কোন একটা স্টেশনে একটা লোককে দেখে বাবলু হঠাৎ চমকে উঠেছিল। ঝকঝকে দুটো চোখ, বাবলুর দিকে যেন ঝাঁ ঝাঁ করে তাকিয়ে আছে। ঠিক সে সময়ই চশমাটা ঝাপসা দেখাল। বাবলু চশমা খুলে কাঁচ দুটো পরিষ্কার করে, চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে লোকটা হাওয়া হয়ে গিয়েছে। কোথাও নেই।

ব্যাপারটা খুব ভাল লাগছিল না বাবলুর। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল। এতদিন মনের কোণে কোন ভয় ছিল না। তখন অল্প ভয় করছিল। সেই লোকটা যদি কোন খারাপ দলের লোক হয়?

কোন গুণ্ডা দলের সর্দার হয় ? বিদেশ বিভুঁই-এ কী করবে বাবলু ? রজতও নেই যে বুদ্ধিটুদ্ধি বাতলে দেবে।

হঠাৎ সুবল মামার কথা মনে পড়েছিল বাবলুর। সুবল মামা সখের গোয়েন্দা। বাবলুর যা কিছু বিদ্যে সবই সুবল মামার কাছে শেখা। একবার মনে হয়েছিল এ বিষয়ে একটা চিঠি ছেড়ে দেয় সুবল মামার নামে। আবার ভেবেছিল এখন থাক ভেবে-টেবে পরে যা হয় করা যাবে।

ভয়টা বোধহয় মনের মধ্যে ছিল। বাংকে শুয়ে বাবলুর ঠিকমত ঘুম আসছিল না। অথচ সারা কামরায় লোক ঘুমিয়ে। গাড়ির ঢুলুনিতে না ঘুমুতে পারার কোন কারণ নেই। মুখ-মাথা ঢেকে শুয়েছিল বাবলু। আচমকা কেমন যেন মনে হয়েছিল মুখের সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে গরম নিশ্বাস পড়ছে।

নিশুতি রাত। ট্রেণটাও জোর চলছিল। গাঁ গাঁ গাঁ শব্দ হচছিল। কামরার আলো মিটিমিটি। ঘুমন্ত এ কামরায় কেউ যদি বাবলুর গলা টিপে ধরে ? বলে এই যে ক্ষুদে টিকটিকি সেদিন খুব ওস্তাদি করেছ, এবার ? এবার কি হবে।

মুখের চাদরটা সরিয়ে অন্ধকারে ঘুম চোখ মেলে তাকাতেই বাবলুর মনে হয়েছিল, একটা ছায়া সাঁৎ করে সরে গেল।—'কে ?' বাবলু অস্ফুট গলায় বলেছিল।

কোন বাংকে কোন লোক পাশ ফিরে শুচছিল। ট্রেণের আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কারও নাক ডাকার ঘড়ঘড় শব্দ ভেসে আসছিল। কপালে হাত বুলিয়ে আবার পাশ ফিরেছিল বাবলু। তবে কী সে স্বপ্ন দেখছিল ?

যাই হোক এখন পিসিমার এই কাশীর বাড়িতে বালিশটা টেনে নিয়ে বাবলুর ঘাড়ের নিচে রাখল। নাকডাকা শুরু হয়েছে। কেবল মনে মনে ভাবল, সেই লোকটাকে ভয় পেলে চলবে না। সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে। সাহস না হলে কিছুই হয় না।

॥ বিকেলে বেড়ানো ॥

কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল বাবলু। ঘুম ভাঙতে বেশ একটু বেলা হয়ে গেল। টুকুন বলল তোর ঘুম কীরে বাবলু, ডাকছি তো ডাকছি। সাড়াই নেই।

বাবলু চোখ রগড়ে উঠে বসল খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তা তো দেখতেই পারছি। আর দেরি করিসনে ওঠ। কেদারঘাট থেকে আজ নৌকো করে মণিকর্ণিকা অবধি বেড়াতে যাবার কথা আছে।

বাবলু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। নৌকো করে বেড়ানো। কতকাল বাদে নৌকো চাপা হবে। আগের বার বাবা মা বাবলু টুকুনদা পিসিমা পিসেমশাই সবাই মিলে দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে ভাড়া নৌকোয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়েছে। কী মজাই লাগে। মা নৌকোয় বসে গান গেয়েছিল। পিসেমশাই নৌকোর পাটাতন বাজিয়ে তাল দিয়েছে। বাবার আর পিসিমার সে কী হাসি। বাবলু বলল, কে কে যাবে? পিসিমা পিসেমশাই যাচছেন?

ধুস। আমরা দুজন আর আমার বন্ধু কেদার আর ফকির যাবে। কেদার যা ভাল দাঁড় টানে না। ফার্স্ট ক্লাস।

নৌকোয় মাঝি থাকবে না?

না মাঝি কিসের? টুকুন হাল্কা গলায় বলল, আজকাল আমরা আর মাঝি নিই না। টাকা জমা দিয়ে নৌকো নিয়ে যাই। সময় মত ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

বাবলু চোখ বড় বড় করল ভয় করে না?

কিসের ভয়?

নৌকো যদি উল্টে যায়।

যে চালাতে জানে তার ভয় কিসের? তুই যে সাইকেল চালাস, ভিড়ের রাস্তায় তোর ভয় করে?

বাবলু ঘাড় নাড়ল।

তবে ? প্রথম প্রথম আমরাও মাঝি সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। এখন নৌকো চালানো শিখে গিয়েছি আর আমাদের পায় কে। ফকরে হাল ধরে। আমি আর কেদার দাঁড় টানি। তবে কেদারই বেশি চালায়।

মুখে সাহস দেখালেও মনে মনে ঠিক সাহস পাচছিল না বাবলু। একেবারে মাঝি ছাড়া গঙ্গায় নৌকো চড়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না বাবলু। কিন্তু টুকুনদাকে কিছু বলা চলবে না। বললে এক্ষুনি ক্ষেপাতে সুরু করবে। তাছাড়া টুকুনদারা যদি সাহস করে, নৌকো বেয়ে চলতে পারে, তবে বাবলু কেন ওদের সঙ্গে যেতে পারবে না ? খুব পারবে।

রাস্তায় বের হয়ে টুকুন বলল চল তোকেও ট্রেণিং দেব। সাতদিনে, তুইও আমাদের মত, দাঁড় বাইতে পারবি।

সত্যি। বাবলু উত্তেজিত হয়ে উঠল। সত্যি বলছ।

খুব একটা শকত কাজ নয়। হাতের ছাল-চামড়া উঠে যাবে একটু। তা যাক। দু দুটো দাঁড় ঠিক তালে তালে ফেলতে পারলেই হয়ে গেল।

কুচবিহারেব কালীবাড়ির পাশের গলিটার মুখে কেদার আর ফকির দাঁড়িয়ে। টুকুনকে দেখেই ফকির চিৎকার করে উঠল এই টুকুন এত দেরী করলি কেন ?

টুকুন বাবলুকে দেখিয়ে বলল একে নিয়ে আসতে গিয়েই যত দেরী। বাবু এত ঘুমোচছে যে ঘুমই ভাঙে না।

ফকির বাবলুর মুখের দিকে তাকাল। কেদার একবার দেখেই বলল—এ তোর মেজমামার ছেলে না ? দু বছর আগে পুজোর সময় এসেছিল ?

টুকুন ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ ঠিক ধরেছিস।

কী ভাই চিনতে পারছ ? কেদার হাসল।

বাবলু এতক্ষণে চিনতে পারল। বিজয়াদশমীর দিন সাগু-ক্লাবের সঙ্গে কী একটা ব্যাপারে কেদার ওর নজরে পড়েছিল। একাই মেরে পাট করে দিয়েছিল কয়েকজনকে। বাবলু হাসি মুখে বলল, তোমাকে চিনতে পারব না। বাপস। এক একটা ঘুষি যা চালিয়েছিলে সেদিন।

কেদার হাসল। মনে আছে এখনও ?

থাকবে না।

ফকির গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল কদিন থাকবে এবার ?

দিন পনেরো কুড়ি—

না না। মাসখানেক থাকবে ও—টুকুন বলে উঠল যেতে চাইলেই যেতে দিচ্ছে কে। আমাদের ক্লাবের এ্যানুয়েল ফাংসান-এর পরে যাবে।

সেই ভাল। কেদার বলল, থেকে যাও বুঝলে

ওরা নদীর ঘাটে আসবার পর মাঝি শিউদাস বলল খোকাবাবু সনঝা হয়ে আসছে আমি সঙ্গে যাই।

কেদার বলল তুমি মাঝি বুড়ো হয়ে গেছ। চোখে কম দেখ। সন্ধ্যে কোথায় ? এখনও ঢের বেলা রয়েছে।

নৌকোটা হড়হড় করে জলে নামিয়ে দিল কেদার। মাঝি আবার বলল, মাঝ দরিয়া দিয়ে যাবে না খোকাবাবু, কিনারে কিনারে যাবে।

ফকির উত্তর দিল আজ আমরা নতুন নৌকো চালানো শিখছি নাকি।

বিকেলের আলো জলে চিকিমিকি কাটছে। ধীর বাতাস বইছে। আরও দু-চারখানা ডিঙি নৌকো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা লোক ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছে নদীর। একটা নৌকো থেকে গান ভেসে আসছে। দূরে জলের ওপর মস্ত বড় একটা নৌকো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছিপের মতো সরু নৌকো সাঁ সাঁ করে হাওয়ার বেগে উড়ে গেল।

টুকুন বলল, 'বাবলু একটা গান ধর।'

বাবলু লজ্জা পেল, 'কি যে বল টুকুনদা, আমি গান জানি নাকি!'

বাবলু একটু চুপ করে থেকে রবীন্দ্রনাথের একটা গান ধরল।

গানটা শেষ হতেই কেদার বলল, 'টুকুন আমাদের ক্লাবের মেম্বার করে নে বাবলুকে। এবার এ্যানুয়েল ফাংসানে বাবলুর গান দেব।'

'তা হলেই হয়েছে! ফাংসান আর কেউ শুনবে না।'

সবাই হাসল।

নৌকো চলেছে তো চলেছেই।

—ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে। জলের ছায়া কালো। আকাশটাও কালো দেখাচ্ছে। দূরে কোথাও একটা পাখি, একা একা উড়ে যাচ্ছিল। কেদারের দাঁড়ের টানে একইভাবে উঠছে পড়ছে। দড়ি বাঁধা টানে একটা ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ হচ্ছে। ফকির হাল ধরে জলের দিকে চেয়ে আছে। টুকুন হাত দিয়ে ঠাণ্ডা জল ছুঁয়ে নিচ্ছিল।

হঠাৎ সামাল সামাল রব উঠল। আশপাশের নৌকো হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। একটা নৌকো তীরের বেগে ছুটে আসছিল। কেদার হাঁক পাড়ল, হুঁশিয়ার। কিন্তু কে কার কথা শোনে। নৌকোটা যেন, ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার জন্যেই ছুটে আসছে। ফকির আচমকা প্রাণপণে হাল ঘোরাল। কেদার আপ্রাণ চেষ্টায় নৌকোটাকে ঘুরিয়ে নিল। টুকুন জলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। খুব বেঁচে গেছে আজ। আর একটু হলেই একটা বিপদ ঘটত। বাবলু শুধু আবছা অন্ধকারে সেই ছুটে আসা নৌকোটায় একটা চেনা মুখ দেখে চিৎকার করে উঠল, ও কে ও? কে।

॥ বাড়ির পথে ॥

ঘাটে নৌকো জমা করে, কেদার বলল, 'বুড়ো আর একটু হলেই মরছিলাম আর কি, নৌকো ডুবে যেত, বুঝেছ।'

শিউদাস চোখ তুলল, 'কেন ?'

'কেন আবার, একটা নৌকো আমাদের ধাক্কা দেবার জন্যে ছুটে আসছিল। ইচ্ছে করেই আসছিল। আমরা হুঁশিয়ারি দিয়েছি, শোনেনি।'

'রাম রাম, সীয়ারাম!' শিউদাস নিজের কপালে হাত চাপড়াল। 'রামচন্দ্রজী খুব বাঁচিয়েছেন। আজ আমি বিরজু গুণ্ডার সাকরেদদের গঙ্গায় দেখেছি। ও বদমাসরাই হোবে। নাহলে নাও-এ ধাক্কা লাগাবে কে ?'

'বিরজুগুণ্ডা!' ফকির মুখ কোঁচকাল, 'আরে গণেশমহাল্লায় থাকে না ?'

হ্যাঁ। খোকাবাবু। বড় পাজী।

টুকুন ঠিক কথা বলতে পারছিল না। আজ জীবনে এই প্রথম বিপদে পড়েছিল টুকুনরা। বলা নেই, কওয়া নেই, ভুম করে একটা নৌকো এসে তাদের নৌকোয় ধাক্কা মেরে জলে ডুবিয়ে দিতে চাইবে, একথা যেন ভাবাই যায় না। তাছাড়া বাবলুকে আজই প্রথম নিয়ে এসেছে টুকুন। যদি কোন বিপদ-আপদ হত, তাহলে কী করে বাড়িতে মুখ দেখাত টুকুন। মামারবাড়ি যাওয়াও তার চির-কালের মত উঠে যেত।

টুকুনের কেমন যেন রাগ হচ্ছিল। টুকুন অনেকটা রাগের গলায় বলল, 'তুই বড় অপয়া বাবলু। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কী!'

বাবলু কী উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বাবলু বলল, 'ওরা যে আমাকে এখানেও ফলো করবে সে কথা ভাবিনি।'

কেদার গম্ভীর হল। টুকুনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই বাজে কথা বলছিস টুকুন। বাবলুর কী দোষ!' তারপর বাবলুর দিকে চেয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কী! কারা ফলো করেছে ?'

বাবলু বলল। 'চল কোথাও বসি। তারপর বলছি।'

ঘাটের একটা ফাঁকা জায়গায় বসল চারজন। কেদারেশ্বর শিবের মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজছে। একটা ষাঁড় তুলকি চালে চলতে চলতে ফুলের মালা খাচ্ছে। কয়েকজন বৃদ্ধ মানুষ জলের ধারে বসে পূজাআহ্নিক করছেন, ছোট ছোট কয়েকটি ছেলেমেয়ে, খেলার ছলে, একবার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, আবার নামছে।

টুকুন পিছনে হাত রেখে, হাতের ওপর ভর দিয়ে বসল। ফকির আসন পিঁড়ি, কেদার দু'হাঁটুতে গাল রেখে বাবলুর দিকে তাকাল। বাবলু পা ঝুলিয়ে দিয়েছে। বাবলু তাদের পাড়ায় সেই লরি ধরার গল্পটা বলে বলল, 'ব্যাপারটা ঠিক বোঝাবার মত নয়। আমিও মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। তবে লোকটাকে আমি দেখেই চিনতে পারি। ওই ঘটনার পর থেকে লোকটাকে আমি বার দু-তিনেক দেখেছি, এখন ওর মুখটা আমার চেনা হয়ে গেছে। কাল ট্রেণে আমার মাথার কাছে দেখেছি। এখন ওই নৌকোটার মধ্যে দেখলাম। চোখে একটা কালো চশমা দিয়েছিল বলে আমার প্রথমে চিনতে অসুবিধে হয়েছে। কিন্তু ও মুখ একবার দেখলে আর ভুল হয় না।'

টুকুন বলল, 'লোকটা কী তবে প্রতিশোধ নিতে চাইছে?'

'হতে পারে।' ফকির বলল, 'বাবলুর জন্যে ওদের অনেক টাকার জিনিষ হাতছাড়া হয়ে গেছে। হয়ত শায়েস্তা করলে চায় বাবলুকে।

'কিন্তু সেজন্য কোলকাতা ছেড়ে বেনারস কেন? টুকুন আবার বলল।

কেদার বলল, 'হতে পারে, এটা কোন ছোটখাট ব্যাপার নয়। হয়ত ইণ্ডিয়া জুড়ে ওদের দল। সারা ভারতবর্ষ জুড়েই কাজ কারবার। বেনারসে কোন কাজে আসছিল লোকটা, বাবলুকে দেখেই চমকে উঠেছে। বাবলুর জন্যেই সেবার ওদের গাড়ি ধরা পড়ে।'

বাবলুর গলা নরম শোনাল, 'আমার জন্যে তোমরা ভাই বিপদে পড়ছিলে।'

ফকির বলল, 'চুপ কর। বাজে কথা বলবি না বাবলু। মা গঙ্গার বুকের ওপর বসে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে। তোর বিপদও যা, আমাদের বিপদও তাই।'

টুকুন বলল, ঠিক।

'তবে' কেদার চিৎকার করে উঠল, 'তোর আবার বিপদ কী। বিপদ আমাদের,---আমাদের সকলের। তোর সঙ্গে যারা লড়তে চায়, তাদের আমাদের সঙ্গেও লড়তে হবে।' হাত বাড়িয়ে দিল কেদার, 'আমরা ছোট হলেও যা তা না।'

আনন্দে খুশিতে বাবলুর চোখে জল ভরে এল। বাবলু কেদারের হাত ধরল। সেই জোড়া হাতের ওপর হাত রাখল টুকুন আর ফকির। কেদার বলল, 'এখানে আর নয়। চল ক্লাবে যাই। ওখানে নান্নু আর রফিক আছে। আর আছে ব্রজদা। সবাই মিলে পরামর্শ করে যা হোক একটা কিছু ঠিক করা যাবে।'

॥ ব্রজদার সঙ্গে ॥

ইজিচেয়ারে শুয়ে ব্রজদা শিলিংয়ের কড়িকাঠ গুনছিল।

বাবলু চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল। কত আর বয়েস হবে ব্রজদার ; বাইশ তেইশ। লম্বা চেহারা, ফর্সা টুকটুকে। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া একমাথা চুল। ব্রজদাকে দেখলেই, কবি কবি মনে হয়। একপাশে নান্নু, ওপাশে রফিক, দুজনে মিলে লুডোর দান চালছে।

ওদের দেখেই ব্রজদা চিৎকার করে উঠল, 'এই যে ট্রায়ো, এত দেরী! তারপর বাবলুকে দেখে বলে উঠল, 'এই পুচকেটাকে কোথা থেকে যোগাড় করলি?'

কেদার বলল, 'ব্যাপার সিরিয়াস ব্রজদা! লাইফ এণ্ড ডেথের কোয়েশ্চেন!'

ব্রজদা চোখ তুলল, সে কি রে। কী হল! এককেবারে লাইফ এণ্ড ডেথের কোয়েশ্চেন! তারপরই গলা চড়িয়ে আবৃত্তি ধরল ব্রজদা, 'লক্ষ পরাদে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ। জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন। তারপর কী ব্যাপার।'

গোটা ঘটনাটা শুনে ব্রজদা বলল, 'নান্নু, নস্যি দে। মাথার ভেতর কেমন ভারী হয়ে গেছে, বুদ্ধি খুলছে না।'

নস্যির ডিবে এগিয়ে দিয়ে নান্নু বলল, 'ব্রজদা, পাথরের দেওয়ালে মাথাটা বারতিনেক ঠুকে নাও, তাহলে যদি খোলে।'

'ঠাট্টা—' ব্রজদা চোখ পাকাল, 'আমার নাম ব্রজনাথ সেনশর্মা,—আমার সঙ্গে বাঁদরামি।'

ব্রজদা নাকে নস্যি দিয়ে বলল, 'যা বলছি, মন দিয়ে শোন সবাই। কাল থেকে দিন দুয়েকের জন্য বাবলুকে পাড়ার বাইরে বার করবি না। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হো-হো করে গল্প কর, পঞ্চুর দোকানে তেলেভাজা খা, কিন্তু দূরে কোথাও নৈব নৈব চ। এর ওপর যদি কেউ নজর রেখে থাকে তাদের টেনে আনতে হবে পাড়াতে।'

কেদার, ফকির, টুকুন, বাবলু, নান্নু আর রফিক সবাই চুপ করে মন দিয়ে ব্রজদার কথা শুনছে। ব্রজদা আবার বলল, নান্নু আর রফিক তোদের ওপর আমি একটা বিশেষ কাজ দেব। তোরা দুজনে গণেশ মহল্লায় যাবি। বিরজুর সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগ আছে কি না, সেটা জানতে চেষ্টা করবি। দেখবি তোদের যেন কেউ চিনতে না পারে।

রফিক হাসল, 'তুমি ভেবো না, আমাদের কেউ চিনতে পারবে না। আমি দাড়ি লাগিয়ে, মাথায় কেজ দিয়ে এমন সাজব যে কেউ রফিক বলে ধরতে পারবে না।'

নান্নু দুঠোঁট টিপে চোখদুটো কুতকুতে করে বলল, আমি ভিখারী সাজব। আমার পোষা বাঁদরটাকে নিয়ে যাব।'

ব্রজদা উঠে দাঁড়াল, 'কাল সন্ধ্যায় আমরা ক্লাবে আসছি সবাই। সন্ধ্যে সাতটা।'

ব্রজদা চলে যেতে কেদাররা উঠে দাঁড়াল। নান্নু আর রফিক এসে বাবলুর হাত ধরল 'আরে ভাই, তুমি এসে জোর কাণ্ড বাধালে। এতদিন শুধু লুডোর ছককাপাঞ্জা চেলেছি। আমাদের কি ওসব ভাল লাগে!'

হাসির মধ্যে সন্ধ্যেটা শেষ হয়ে গেল। বুকের মধ্যে যেটুকু ভয় ছিল সেটুকু উবে গিয়েছে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বাবলুর মনে হল, জীবনে কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে, জীবনটা সত্যি বড় একঘেয়ে হয়ে যায়। বেশ বলেছে ব্রজদা, 'লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারও ঋণ। জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।'

॥ মোড়ের মাথায় ॥

বড় রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে সোনারপুরা, উত্তর দিকে মদনপুরা হয়ে একেবারে গোধুলিয়ায় গেছে। আড়াআড়ি কাটা পাঁড়ে-হাওলি, পুব দিকে গঙ্গার ঘাটে আর পশ্চিমদিকে রেউড়িতলার দিকে ঘুরে গিয়েছে। এপাশে বাঙালিটোলা কলেজ ওপাশে এ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুল। রাস্তার উলটো দিকে রামের বই-এর দোকান, ওপাশে আবার কুচবিহারের কালীবাড়ির সামনাসামনি ঘটকদের কয়লা-ইট-চূণ-সুরকির গোলা।

সকাল থেকেই পঞ্চুর দোকানে ভিড় জমিয়েছে কেদাররা। বেঁটে মতন একটা ছেলে হাতের মাসল ফুলিয়ে ফুলিয়ে দেখাচ্ছিল। টুকুন আর বাবলুর পাশে এসে বসল।

ফকির চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'এই যে বাবলু আয়। তোর জন্যে এতক্ষণ আমরা বসে আছি।'

বাবলুর আজ বড় ভাল লাগছিল। সারারাত চমৎকার ঘুমে কেটে গিয়েছে। সকালে উঠেই ভাল ভাল খাবার, দুপুরে আবার মাংস

আছে। হাফিজের দোকানের মাংস, পিসিমা বলেছেন দো-পেঁয়াজি রাঁধবেন।

যে ছেলেটা মাস্‌ল ফুলিয়ে দেখাচ্ছিল তার নাম লংকা। কেদার তাকে বলল, 'এই লংকা বাবলুকে চিনে রাখ। ও আমাদের বন্ধু—ফ্রেণ্ড। বাবলুকে সব সময় তুই চোখে চোখে রাখবি। কখনও চোখের আড়াল হতে দিবি না।'

বাবলু লংকার দিকে তাকিয়ে দেখল। ঘাড় বলতে কিছু নেই। নেড়া মাথা। মাথার পরই ধড় লংকার। তারপরই পা। অনেকটা বাবলুদের ক্লাসের ব্যোমবোমের মত দেখতে। তবে চেহারাতেই বোঝা যায় লংকার গায়ে খুব জোর। দুটো একটা আচ্ছা আচ্ছা লোককে ঠাণ্ডা করে রাখতে পারে লংকা।

চোখে চোখে রাখবার কথা শুনে টুকুন জিজ্ঞেস করল, 'ওকে এ কাজটা কে দিল—ব্রজদা?'

কেদার ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'দেখ আমাদের সবার একসঙ্গে সবসময় থাকা উচিত নয়। বাবলুকে মাঝে মাঝে একলা ছেড়ে দিতে হবে। তখন এমন একটা লোক চাই যে ঝামেলা সামলাতে পারবে। লংকা সে কাজে খুব ওস্তাদ, তুই কী বলিস?'

টুকুন ঘুগনির অর্ডার দিল দোকানে। তারপর বলল, 'সে আর বলতে। বাপস! সেবার ওপাড়ার সঙ্গে মারামারির সময় লংকা না থাকলে রফিককে বাঁচানোই যেত না।' একাই দশবারোজনকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল লংকা।

লংকা দাঁত বার করে হাসল। ফকির আঙুলে লংকার মাস্‌ল টিপতে টিপতে বলল, 'পাথরের মত শক্ত।'

বাবলু বলল, 'আমার জন্যে একজন সারাদিন রাত আটকে থাকবে এটা কি ঠিক হচ্ছে?' ব্রজদা একটু বেশি ভাবছে আমার জন্যে!

ফকির হাসল, ‘আমরা ব্রজদার আদেশ তামিল করি। কেন করছে জিজ্ঞেস করি না।’

বাবলু লজ্জা পেল, ‘না, সেভাবে আমি বলিনি।’

কেদার চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিল,‘আজকে আর কালকের দিনটা দেখা যাক। এই সোমবার থেকে হয়ত দেখবি ব্রজদা তোকে একা একাই ছেড়ে দেবে। ব্যাপারটা বুঝে নিতে চাইছে ব্রজদা।’

কিছুক্ষণ পর চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ওরা রাস্তায় এসে দাঁড়াল। একজন অল্পবয়সী ছিপছিপে ছোকরা চোখে নীল চশমা এঁটে, আতরমাখা অল্প অল্প দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে, ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। সিল্কের লুঙ্গি পড়েছে। গায়ে পাঞ্জাবি। মুখের মধ্যে পান আছে।

ফকির তা দেখে বলল, ‘দারুণ সেজেছে রে।’

টুকুন বলল, ‘তোর তাতে কী।’

কেদার বলল, ‘তোদের সবতাতেই বাজে কথা।’

লোকটা যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। তারপর হেসে বলল,‘বাবুজী এই দুনিয়ায় আল্লা যা করেন তাই হয়। তোমার আমার ইচ্ছাতে তো কিছু হয় না বাবুজী।’

লোকটা দাঁড়াল না। চলে গেল। কেদার স্কুলের পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ফকির উবু হয়ে বসল। টুকুন দাঁড়িয়ে আছে। বাবলু বলল, ‘টুকুনদা গলাটা চেনা চেনা লাগল আমার।’

ওরাও বোধ হয় সবাই তাই ভাবছিল। বাবলুর কথায় চমকে ফিরে কেদার বলল, ‘হ্যারে ঠিক বলেছিস। আরে রফিক না? একদম ধরতে পারিনি।’

‘সাবাস’। ফকির বলল।

টুকুন হাসল, ‘আমাদের এত চেনা। আমাদেরই চোখে ধুলো দিয়েছে। বিরজু ওকে ধরবে কোত্থেকে।’

দূরে কোন পেটা ঘড়িতে এগারোটা বেজে গেল। যারা আসবার

তারা এখন আসবে না। সপ্তরথীর অভিমন্যুকে ঘিরে ধরার মত ওরা বাবলুকে ঘিরে আছে। একদম বোকা না হলে কেউ এ সময়ে এসে কিছু করতে চাইবে না। কেদার বলল, 'দূর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর ভাল লাগছে না, চল বাড়ি যাই। বিকেলে আবার সবাই এখানে আসব।'

টুকুন বলল, 'একেবারে আমাদের বাড়িতে চলে আসিস। এখান থেকে জলটল খেয়ে বের হব।'

লংকা বলল, 'আমিও আসব।'

টুকুন বলল, 'আসবি।'

॥ রফিকের কেরামতী ॥

গলিতে ঢোকবার আগে ব্রজদার কথাগুলো আর একবার মনে করে নিল রফিক। বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে গলি। বাঁদিকের গলি দিয়ে পঞ্চাশ পা হেঁটে যাও। ডানহাতি মোড় নাও। এবার বিশ পা হাঁটো। তারপর বাঁদিক। এখানে গলিটা চওড়া। গলির ডানদিকে সফিউলের বেনারসী শাড়ি তৈরির কারখানা। বাঁদিকে একটা খাটাল। গলিটা পেরিয়ে উত্তর দিক বরাবর মিনিট তিনেক হাঁটো। গলিটা নেমে যেন পাতালের দিকে যাচ্ছে। দু'পাশে গায়ে গায়ে বাড়ি। এ ছাদ থেকে ও ছাদ যেতে লাফাতে হয় না। সেই পাতালে নেমে দক্ষিণ দিকে বাঁক নাও। আবার গলিটা উপরের দিকে উঠছে। একটার পর একটা সিঁড়ি। সামনেই একটা ভাঙা দেউড়ি। দেউড়িটা পেরিয়ে একটা মাঠ। কোনকালে বোধ হয় বড় বাড়ি ছিল, এখন ভেঙ্গে ময়দান। এখানেই পাশাপাশি কয়েকটা ভুজাঅলার দোকান একটা চায়ের দোকান। সামনের তিনতলা বাড়িটা বিরজুর। বাড়ির দেওয়ালে রঙ দিয়ে তিনটে ছবি আঁকা। প্রথম ছবি একটা লোকের ; সে দু হাতে মুগুর ভাঁজছে। দ্বিতীয় ছবি দশ মুণ্ড একটা সাপ ফনা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তিন নম্বর

ছবিটা এইরকম—গাধার পিঠে একটা মানুষ তার আবার দু কান কাটা।

ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ব্রজদা বলেছে, বিরজু সাপের মত খল, একটু কিছু টের পেলেই গাধার পিঠে চড়া লোকটার মত অবস্থা হবে তোর। খুব সাবধান! সাপের গর্তে পা দিতে যাচ্ছিস তুই।

অবশ্য রফিকের তাতে কিছু যায় আসে না। রফিকের প্রাণে ভয়ডর নেই। পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই রফিকের। একটা নানী ছিল সেও কবে মরে গেছে। তবে আর ভয় কিসের? বাঁচার মত বাঁচতে না পারলে বেঁচে লাভ কী।

আলিমুদ্দিন চাচার পানের দোকানে দাঁড়াল রফিক। চাচা বুড়ো হলে কি হয় অনেক খবর জানে। শকুনের মতো চোখ চাচার। একবার যাকে দেখে তাকেই চিনে রাখে। তাছাড়া লোকটার প্রাণে দয়ামায়া আছে। ভালো লোকের ভাল করতে পিছপা হয় না চাচা।

একনজর দেখেই চাচা হেসে ফেলল। বলল, 'এত সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছিস রফিক।'

রফিক গলা নামিয়ে বলল, 'বিরজুর কাছে।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল আলিমুদ্দিন, 'সেখানে কী দরকার?'

'একটু দরকার আছে চাচা।'

'দরকার থাকুক। তোকে যেতে হবে না রফিক।'

রফিক হাসল। হেসে পা বাড়াল। চাচা বলে উঠল, 'যাবি যখন তখন শোন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবি গুলু ওস্তাগারের বাড়ি যাব। আলিমুদ্দিন চাচা পাঠিয়েছে।'

বাড়ি চিনে নিতে অসুবিধা হল না রফিকের। ছবি তিনটেই চিনিয়ে দিল। কিন্তু এখন কী করবে রফিক? কোথায় যাবে? ব্রজদাকে বলেছে খবর জোগাড় করে আনবে। কিন্তু কী করে খবর

জোগাড় করবে রফিক? কাকে জিজ্ঞেস করবে? জিজ্ঞেস করলে সন্দেহ হতে পারে। কে যে শত্রু, কে যে বন্ধু—কী করে চিনবে রফিক? এর চেয়ে চাচাকে সব খুলে বললেই হত। চাচাই বলে দিতে পারত সব।

চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল রফিক। দোকানের ভেতরে কয়েকজন ছোকরা বসে গল্পটল্প করছে। উনুনে কাঁচা কয়লার ধোঁয়া। ছেলেগুলোকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। তবে একটু আধটু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

বেঞ্চের ওপর বসে রফিক বলল, এক কাপ চা দাও ভাই।

ছোকরা চাকরটা উনুনে বাতাস দিতে দিতে বলল, দেরী হবে।

রফিকও মনে মনে তাই চাইছিল। বিরজুর বাড়ির ওপর নজর রাখতে গেলে, বসতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে চা দিলে কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়। বন্ধুবান্ধব থাকলে বসা যায়। নইলে শুধু শুধু বসে থাকলে, লোকে প্রশ্ন করবে। কী দরকার? কোথা থেকে আসছ। যাক সুযোগ পাওয়া গেছে। এখন উনুন ধরবে। জল গরম হবে। তারপর চা।

বিরজুর বাড়ির দিকে ঘুরে বসল রফিক। সামনের জানালাগুলো সব বন্ধ। সদর দরজা খোলা আছে। সেখানে দুটো দারোয়ান দরজা আটকে দাঁড়িয়ে। রাস্তায় খাটিয়ায় একটা লোক শুয়ে। দুজন লোক এক বাটি তেল নিয়ে তাকে দলাই মলাই করছে। একটা বাচ্চা ছেলে রাস্তার কলে চান করছে। ঝুড়ি মাথায় একটা মেয়ে, আলু লেবে গো···ভিণ্ডি লেবে গো···বাইগন। হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছে।

বিরজুকে চেনে রফিক। তার গালের ওপর মস্ত একটা কাটা দাগ। যে লোকটা শুয়ে সে বিরজু নয়। বিরজু আরও তাগড়া। মাথা নেড়া বিরজুর।

দোকানের ভেতরে কে একজন বলে উঠল, 'নাল পাগড়ী এসে গেছে।'

'কিছু এনেছে ?' আর একজন জিজ্ঞেস করল।

প্রথম ছেলেটা উত্তর দিল 'নিশ্চয়ই' সঙ্গে একটা ভারি বস্তা। আমি দেখতে গেলাম ভাগিয়ে দিল। বলল, বেড়াল আছে। বিল্লি। বলে সে হাসল।

আর একটা ছেলে বলে উঠল, নীল পাগড়ীট শয়তান। আমাকে একদিন বহুত পিটেছে। গায়ে এখনও ব্যথা হয়ে আছে।

রফিক কথাবার্তাগুলো ভাল করে শোনবার জন্যে চোখ তুলতেই ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। কে একজন বলল, আরে, এ যে অচেনা লোক।

অন্য একটা লোক চিৎকার করে উঠল, এই কি দরকার তোমার ?

রফিক হাসল, চা খাব বলে বসে আছি বাবা।

ভাগ এখান থেকে।

রফিক যাবে কি যাবে না ঠিক করতে পারছিল না। গুলু ওস্তাগারের কথাটা বলতে পারে রফিক। থাক দেখাই যাক না কী হয় শেষ পর্যন্ত।

গলির মুখে হঠাৎ ডুগডুগির শব্দ উঠল। রফিকের মুখ চকচক করে উঠল। নান্নু আসছে। আর ভয় নেই। সঙ্গে এক বন্ধু আছে। এ পৃথিবীতে কার পরোয়া করে রফিক ?

॥ ভুরি ভোজ ॥

সিঁড়িতে পায়ের দুপদাপ শব্দ উঠল। কেদার আর ফকির এক সঙ্গে ডাকল, মাসিমা। পিছন থেকে লংকা বলে উঠল, আমিও এসেছি মাসিমা।

লংকার গলাটা সত্যি অদ্ভুত। খুব সরু। ঐ রকম গাঁট্টাগোট্টা চেহারার ভেতর থেকে এমন আওয়াজ বেরুতে পারে ভাবাই যায়

না। শুনলেই হাসি পায়। হাসি চাপতে চাপতে টুকুনের মা বললেন, আয়! এসে বোস তোরা। মাংসটা হলেই খেতে দেব।

ডান দিকে দোতলার সিঁড়ি, সামনে বারান্দা। কেদার ফকির সিঁড়িতে বসল। টুকুন দাঁড়িয়ে রইল। বাবলু কি একটা কাজে একবার রান্নাঘরের দিকে গেল। লংকা বারান্দায় বসে দেওয়ালে ঠেসান দিল।

টুকুন বন্ধুদের চোখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, তুই এলি কেন লংকা, তোকে কে আসতে বলেছিল?

ভুরু কুঁচকে লংকা কেদারের মুখের দিকে তাকাল। বলল, বারে তুই আসতে বললি না।

ঠোঁট টিপে হেসে টুকুন বলল, কেদার আমি ওকে আসতে বলেছিলাম?

কেদার দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখছিল। ফকির মুখ ঘুরিয়ে হাসি চাপছে। কেদার বলল, কী জানি, মনে পড়ছে না।

অন্য কেউ হলে লজ্জা পেত। কিন্তু লংকা সে রকম ছেলে নয়, লংকা একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করল। তারপর ভারিক্কি গলায় বলে উঠল, টুকুন, তুই রোজ পাঁচ পয়সার ব্রহ্মীশাক ঘি দিয়ে ভেজে খা। স্মরণশক্তি বাড়বে।

সবাই জোরে জোরে হেসে উঠল। টুকুন বলল, আরে বাবা। কী বলছে লংকা। ব্রহ্মীশাক। স্মরণশক্তি।

ফকির বলল, খুব বড় বড় শক্ত শক্ত কথা বলছে।

কেদার বলল, বানান কর—বানান কর লংকা।

লংকা হাসল। বানান করতে হবে না। দ্বিতীয় ভাগ দেখে নিস; ওতে বানান লেখা আছে।

বাবলু এতক্ষণে এল। হাতে মস্ত একটা জলের ঘটি। ঘটিটা লংকার কাছে নামিয়ে দিয়ে বাবলু বলল, খেয়ে নে লংকা।

কী।

জল।

জল। লংকা চোখ বড় বড় করল।

বাবলু বলল, জল খাবারের জলটা খেয়ে নে আগে।

জলের ঘটিটা সত্যি সত্যিই হাতে তুলতে যাচ্ছিল লংকা, এমন সময় টুকুনের মা হাঁক দিলেন, কেদার ফকির চলে আয় সব। খেতে দিয়েছি।

লংকা লাফিয়ে উঠল। ঘটিটা রেখে বলল, আগে খাবার, তারপর জল।

সারি সারি পিঁড়ি। ওরা কজন সার দিয়ে গোল হয়ে বসেছে। মাঝখানে থালা। থালায় লুচি আলুর দম। থালার পাশে বাটি সাজানো, মাংস আর পায়েসের।

কী জন্য আজ এত খাওয়া সেটুকু বুঝতে পারছিল না কেদার। অবশ্য মাসিমার এখানে প্রায়ই খাওয়া হয়। কিন্তু আজ যেন অন্য রকম ব্যাপার। একেবারে ভুরিভোজ। কেদার আলুর দমের ঝোল আঙ্গুলে তুলে চাটতে চাটতে বলল, মাসিমা আজ এত করেছেন কেন?

টুকুনের মা হেসে ফেললেন, কেন করেছি বলতো?

কেদার ফকির টুকুন বাবলু সবাই চোখ তুলে তাকাল। লংকা মাংসের একটা হাড় চিবুতে চিবুতে বলল, জানিনা মাসিমা।

আজ যে বাবলুবাবুর জন্মদিন।

বাবলু আশ্চর্য হয়ে গেল, এঁ্যা। আজ আমার জন্মদিন। এঁটো হাতেই বাবলু পিসিমাকে প্রণাম করল, আগে বলবে তো।

জন্মদিনটাও মনে করিয়ে দিতে হবে। তোরা কি রে।

বাবলু হাসল, বুঝলে পিসিমা, ইতিহাসের রাজারাজড়া আর মহাপুরুষদের জন্মদিন মৃত্যুদিন মনে রাখতে রাখতে নিজেদেরগুলো সব ভুলে যাচ্ছি। কীরে টুকুন তাই নয়?

টুকুন ঘাড় নাড়াল। ঠিক বলেছিস।

ফকির বলল, এই লংকা, তোর জন্মদিন কবে?

আজকে, বলেই লংকা মুখে একটা লুচি পুরল।

টুকুনের মা চোখ তুললেন, আজকে কীরে। তুই তো হয়েছিস ভাদ্র মাসে।

মাসিমা আপনার ভুল হচ্ছে। যেদিন ভালমন্দ খাওয়া হয়, সে দিনই আমার জন্মদিন।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। এই সময় বাইরে জুতোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। টুকুনের বাবা আসছেন। তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন. টুকুন বাবলু তোরা কোথায়?

ওরা এক সঙ্গ উত্তর দিল, রান্নাঘরে।

রান্নাঘরে ঢুকে পিসেমশাই একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন বাবলুর দিকে। বললেন, তোর বাবা একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে।

বাবার যে কী কাণ্ড। বাবলু লজ্জা পাচ্ছিল। পিসিমা তার মাথায় হাত রেখে বললেন, দেখেছিস তোর জন্যে তার বাবার কত চিন্তা।

পিসেমশাই বললেন, আচ্ছা রজত বলে তোর কোন বন্ধু আছে বাবলু?

বাবলু ঘাড় নাড়াল। হ্যাঁ, ওই তো আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড।

পিসেমশায়ের গলা এবার গম্ভীর শোনাল। রজতকে দুদিন পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবলু চিৎকার করে উঠল, পাওয়া যাচ্ছে না।

না। কারা যেন তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

কেদার, ফকির, টুকুন, বাবলু, লংকা সবাই থ। কারও মুখে কোন কথা নেই। পিসিমাও চুপ করে আছেন।

কী যে সব দিনকাল হল।

রজত নেই একথা ভাবতেই কেমন যেন কান্না পাছে বাবলুর। মনে হচ্ছে এখুনি তার চোখে জল এসে যাবে।

॥ রজতের কথা ॥

রাগে দেওয়ালে মাথা ঠুকছিল রজত।

সকলেই দু-একবার বোকা বনে। কিন্তু এ যেন ইচ্ছে করে ফাঁদে পা দেওয়া। কী বোকামিই না করেছে রজত।

বাবলু কাশী বেড়াতে গেছে। একদিন রজত স্কুল থেকে একা একা বাড়ি এসেছিল। সারাদিন যেন সময় কাটতে চাইছিল না। বিকেলের দিকে খেলতে যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল রজত। এমন সময় মা বললেন, কাঞ্চনকে একটু দেখ তো রজত। ছেলেটা সেই কখন বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি।

কাঞ্চন রজতের ছোট ভাই। একটু বোকা মতন। কোথাও দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা কিছু একটা করেছে।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। খেলার মাঠে যাবার আগে বাস রাস্তার দিকে একটু দেখতে গেল রজত। ঐ দিকে কয়েকটা ইরাণী বেদে এসেছে। তাদের সঙ্গে কুকুরছানা আছে, ছুরি আছে, আরও কত রকম কী ম্যাজিক জানা আছে তাদের। হয়ত ওখানেই আছে কাঞ্চন।

বৃষ্টিটা একটু জোর হতেই রজত গাড়ি বারান্দার নিচে দাঁড়াল। একটা ভিখারী মেয়ে এক কোণে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্য দিকে একটা নেড়ি কুকুর। রজত নেড়ি কুকুরটার দিকে তাকিয়েছিল। রাস্তার কুকুর। রজতের কেমন যেন মায়া হচ্ছিল। এমন সময় কে যেন ডাকল, রজতদা।

ডাক শুনে রজত চমকে উঠল। দেখল একটা ছেলে। ছেলেটা বলল, রজতদা তুমি এখানে? আমি তোমাকে কত খুঁজেছি। শিগগির চল, কাঞ্চন চাপা পড়েছে।

কাঞ্চন চাপা পড়েছে! কোন কিছু ভাল করে বোঝবার আগেই রজত ছেলেটার পিছু পিছু ছুটে গিয়েছিল। কে ছেলেটা? ছেলেটাকে

চেনে কিনা, রজত ভেবে দেখল না। এক পলক দেখেই কেমন যেন চেনা চেনা মনে হয়েছিল।

বড় রাস্তা ছেড়ে, এ গলি ও গলি ছুটতে ছুটতে একটা খুব সরু গলিতে ঢুকেছিল রজতরা। এ দিকটা অচেনা। কিন্তু তখনও সন্দেহ হয় নি। রজত হাঁপাচ্ছিল। ছেলেটাও হাঁপাচ্ছিল। কাঞ্চনের অবস্থা ভেবে রজত অস্থির হচ্ছিল।

মস্ত একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল ছেলেটা। বলল, এখানে—এখানে বলে ছেলেটা ভেতরে ঢুকল। রজতও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল। দরজা পেরিয়ে একটু ভেতরে যেতেই রজত চিৎকার করেছিল, কোথায় কাঞ্চন? কোথায়?

ঠিক সেই সময় মাথায় ভারি কিছু একটা পড়েছিল যেন। রজত হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তারপর সব অন্ধকার।

অন্ধকার কাটতে রজত অনুভব করেছিল, একটা ঘরের মধ্যে হাত-পা বাঁধা সে পড়ে আছে। আবছা দু-একটা কথা শোনা যাচ্ছে। কে একজন বলল, ছেলেটাকে আজই পাচার করে দাও। দেরী কোর না।

তখনও মাথার ভেতরটা ঠিক পরিষ্কার হয় নি। কথাগুলোর মানে বুঝতে দেরি হচ্ছিল। রজত বুঝতে পারছিল না, কী হয়ে গেল। তাকে ধরে এনে কাদের কী লাভ হবে? সে তো কারও ক্ষতি করে নি, তবে?

দুঃখে, ভয়ে, চিন্তায় রজতের চোখে জল এসে যাচ্ছিল। মার মুখ মনে পড়ছিল রজতের। সেই বড় বড় চোখ। রজত ফেরেনি বলে, মা দরজার পাল্লা ধরে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছেন। চেনাশোনা কাউকে দেখলেই জিজ্ঞেস করছেন, হ্যাঁরে রজতকে দেখেছিস? বাবা হয়ত এখনও ফেরেননি। ফিরলে বাবাও ছুটোছুটি লাগিয়েছেন। এবাড়ি ওবাড়ি যাচ্ছেন। হয়ত হাসপাতালে হাসপাতালে খবর হচ্ছে কিংবা পুলিশে।

রজত চিৎকার করে উঠল। কিন্তু মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের হল না। মুখের ভিতর রুমাল ঠেসে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রজত কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভাঙ্গল যখন, তখন রজত দেখল মাথার ওপর খোলা আকাশ। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। গাছের ডালে পাখি। পাখিরা মনের আনন্দে গান গাইছে। রজত মস্ত একটা লরির উপর শুয়ে ছুরে কেথায় চলেছে।

গোয়েন্দা বই পড়তে পড়তে এ রকম কোন ঘটনা ঘটলে রজত ভাবত বাজে ব্যাপার। লেখক বানানো গল্প শোনাচ্ছে। মারপিট নেই, মুখোসধারীর আবির্ভাব নেই, এ কী রকম কাণ্ড। কিন্তু সেই গল্পটাই যে জীবনে সত্যি হয়ে উঠবে কে জানতো। মানুষকে বোকা বানিয়ে যত সহজে কাবু করা যায়, অন্য উপায়ে তা করা যায় না। রজত নিজের হাত কামড়াল। কী বোকামি করেছে রজত। কী বোকামি।

একটা কথা কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না রজতের। তাকে ধরে এনে এদের কী লাভ। বড়লোকের ছেলেদের অনেক সময় ডাকাতেরা ধরে নিয়ে যায়। টাকা চায়। টাকা পেলে ছেড়ে দেয়। কিন্তু রজতের বাবার তো টাকা দেবার ক্ষমতা নেই। তবে? হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। রক্তচোষা একদল মানুষের কথা মনে পড়ল রজতের। তারা মানুষের শরীর থেকে রক্ত টেনে নেয়, বিক্রি করে।

খুব ঘামছিল রজত। মাথাটাও কেমন যেন ঘুরছিল। চোখের সামনে দিনের আলো কালো হয়ে আসছিল। এটা যে কোন জায়গা বুঝতে পারছিল না রজত। দেওয়ালগুলো পাথরের। ঘুলঘুলির মত জানলা মাথার উপরে। মাটির উপরে না মাটির তলায় এই ঘরটা বোঝা যাচ্ছিল না।

ঝিমঝিম ভাব কেটে যেতে রজত চিৎকার সুরু করেছিল। ইচ্ছে

করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে সে। কিন্তু একটা লোকও আসে নি রজতকে থামাতে, চুপ করতে বলতে।

পাথরের দেওয়ালে দাগ পড়ে না। ঠুকে ঠুকে নিজের কপালটাই ফুলে উঠেছে রজতের। অনেক্ষণ পর রজত চুপ করে গিয়েছিল। রাগে দাপাদাপি করলে কিছু হবে না। ভয়ে ভেঙ্গে পড়লেও হবে না। বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখতে হয়। রজত ভাবতে শুরু করেছিল। কিন্তু সব ভাবনা ছাপিয়ে মার মুখ মনে পড়ছিল রজতের।

॥ বাদুড়ের পাখা ॥

ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর পা তুলে বসেছিল ব্রজদা। বললেন, টুকুন এ ঘরে কটা কড়িকাঠ আছে?

টুকুন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, গুনে দেখিনি ব্রজদা।

কেদার আর ফকিরও জবাব দিতে পারল না। কে আর গুনে দেখেছে। ক্লাবঘরে আসে যায় এইমাত্র। ক্যারাম খেলে, লুডো খেলে। কোথায় দেয়ালে হুক পোতা আছে, কোথায় দেওয়ালের বালি খসে পড়েছে, কে দেখছে।

ব্রজদা বলল, পারলি না! আমি জানতাম তোরা পারবি না। চোখ কান নাক খোলা রেখে চলতে শিখিস নি।

কেদার গাল ফুলিয়ে ফু-উ করে একটা শব্দ করল।

ব্রজদা উঠে বসল। বলল, জানি, এসব তোদের ভাল লাগছে না। কিন্তু সত্যি কী জানিস, চোখ-নাক-কান খোলা না রাখলে কিছুই শেখা যায় না। চোখ দেখে যারা রাম-রহিমের তফাৎ বুঝতে পারে না, কানে শুনে সত্যি-মিথ্যে ধরতে পারে না, গন্ধ শুঁকে বেগুনপোড়া আর মাংসপোড়ার তফাৎ বুঝতে না পারে, তাদের চোখ-নাক-কান আছে বলবি?

ফকির বলল, তুমি যা বলছ ব্রজদা, তাতে খুব ব্রেন দরকার হয়।

ব্রজদা ধমকে উঠল, ব্রেন না ছাই! তোরা সব মাথামোটা গবেট চন্দর।

টুকুন বলল, তা কেন—

ব্রজদা একটু চুপ করে থেকে বলল, বাবলু কোথায় রে?

আসেনি। বাড়িতে শুয়ে আছে।

শুয়ে আছে? জ্বর হল নাকি, না ভয় পেয়েছে খুব?

কেদার বলল, কোনটাই নয়। ওর কোলকাতার এক বন্ধু রজতকে পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় রজতকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।

ব্রজদা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। বলল, আরে, এ খবরটা এতক্ষণ বলিসনি কেন?

বলব কী! তুমি বলবার সময় দিলে কোথায়?

ব্রজদা একটু ভেবে বলল, রজত। বাবলুর বন্ধু রজত। সেই ধরার ব্যাপারে বাবলু সঙ্গে ছিল না? তারপর ব্রজদা নান্নু রফিকের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, নান্নু, রফিক, খবর কী?

নান্নু আর রফিক কিছু বলল, তাদের কথা শেষ হলে ব্রজদা অনেকক্ষণ গম্ভির হয়ে রইল। দুচারবার পায়চারি করল ঘরের মধ্যে। তারপর জড়ানো গলায় বলে উঠল, দুই আর দুয়ে চার।

কেদাররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

এক সময় ব্রজদা বলল, দেখ আমার ধারণা, বাবলুকে যারা ফলো করেছে, তারাই রজতকে ধরেছে। এ-দুটো আলাদা ঘটনা নয়। একটার সঙ্গে আরেকটা জড়ানো। তাছাড়া রফিক যা খবর দিল তাতে দেখা যাচ্ছে নীলপাগড়ী বলে একটা লোক এসেছে। সে সঙ্গে করে একটা জিনিস এনেছে। তাকে ওরা বিল্লি বলছে। বিল্লি মানে বেড়াল। বেড়াল ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে তেড়ে আসে। তাই তাকে বেঁধে এনেছে। বলে নান্নুর দিকে ঘুরল ব্রজদা। বলল, নান্নু, তুই রূপা বাঁদরটাকে ওদের জানলায় তুলে খুব খারাপ কাজ

করেছিস। ধরা পড়লে বিপদ হত। ওদের যখন সন্দেহ হয়েছে, এতক্ষণে জিনিসটা সরিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই। এখন বিরজুর ওখানে গেলে কিছু পাবি না। বিরজুও নেই সুতরাং কিছুই প্রমাণ হবে না।

কেদার বলল, তোমার ধারণা রজত এখানেই আছে?

রজত হতে পারে রজতের মত অন্য কেউ হতে পারে। তবে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তাহলে কী হবে?

ওয়েট কর ধৈর্য ধরতে হবে, দেখতে হবে।

ব্রজদা বলল, বুঝলি না যুদ্ধের আগে সবসময় একটু ঝিম ভাব থাকে। তারপরই আবার কামান গর্জে ওঠে। আমার মনে হয় ওরাও আমাদের লক্ষ্য করছে, দেখছে দু-একদিন-এর মধ্যে কিছু একটা ঘটবে।

ফকির এবার কথা কইল, কিন্তু ব্রজদা, এরা কারা? কী ব্যাপারে এরা আমাদের বয়সী ছেলেদের ধরতে চাইছে?

ব্রজদা হেসে ফেলল। তুইও যেখানে আমিও সেখানে। ওটাই যদি বুঝে ফেলব, তাহলে সমস্যা রইল কোথায়? সেইটাই তো আসল রহস্য।

হঠাৎ বাইরে দুপদাপ পায়ের শব্দ। কেউ যেন মাটি কাঁপিয়ে ছুটে আসছে। ব্রজদা, কেদার, টুকুন, নান্নু সবাই কান খাড়া করে দরজার দিকে তাকাল। আচমকা লংকা ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ সরু গলায় লংকা বলল, ব্রজদা, বাবলুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

নিস্তব্ধ ঘর। একটা ছুঁচ পড়লে বোধ হয় শব্দ শোনা যাবে। হঠাৎ ব্রজদা তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, পাওয়া যাচ্ছে না মানে?

লংকা আমতা আমতা করছে। কেদার বলল, তুই তাহলে কোথায় ছিলি?

লংকার মুখ সাদা হয়ে গেল। বাবলু ওপরের ঘরে শুয়ে আছে

দেখে আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম। এসে দেখি বিছানা ফাঁকা বাবলু নেই।

মাকে জিজ্ঞেস করেছিস? টুকুন জিজ্ঞাসা করল।

লংকা মাথা নাড়ল, করেছি। মাসিমা বললেন, বাইরে গেছে।

কতক্ষণ গিয়েছে?

তা আধঘণ্টা হবে।

ব্রজদা পাঞ্জাবির দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আবৃত্তি করতে লাগল। উর্ধ্বে কালো আকাশের ফাঁকা, ঝাঁট দিয়ে চলে গেল বাদুড়ের পাখা।' তারপর বলল, তোরা দুটো ভাগ হয়ে যা কেদার। একদল গোধুলিয়া দিয়ে গঙ্গার ঘাট ঘুরে দেখে আয়। একদল দুগ্‌গাবাড়িটাড়ি দেখে সোনার পুরা হয়ে আসবি। আমি একবার থানায় পাণ্ডে সাহেবের কাছে যাচ্ছি। দরকার হলে একটা ডায়েরি করে আসব। আর সেরকম কিছু হলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। পাণ্ডে সাহেব লোক ভাল।

বাবলুর খবর পেয়ে টুকুন একেবারে বসে পড়েছে। মেজমামার কাছে কা করে মুখ দেখাবে টুকুন! বাবলুকে যদি না পাওয়া যায়! ব্রজদা টুকুনের দিকে তাকাল। কঠিন স্বরে ব্রজদা বলল, টুকুন ওঠ। এবার আমাদের বেরুতে হবে। আর দেরী করবার সময় নেই, কুইক।

॥ **হিপি সংবাদ** ॥

কেদাররা চলে গেলে বাবলু উঠে বসেছিল।

এরকম একটা খবর পাবার পর কারো মন ভালো থাকে? বাবলুর মন খারাপ হয়ে আসছিল। তার কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল। বালিসে মুখ গুঁজে কান্না চাপতে গেলে শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে।

একটু একটু করে সন্ধ্যা নেমে আসছিল। চারদিক ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। তিলেভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরে ঢং ঢং করে সন্ধ্যা আরতির ঘণ্টা

বাজছে। ঝাকড়া অশ্বত্থ গাছটায় ঘরে ফেরা কাকেরা কা কা করে ডাকছিল। একটা ছোট মেয়ে লাঠির ডগায় পতাকার মত এক টুকরো ন্যাকড়া বেঁধে—চিল ! চিলৌড়ি ! বলে খেলা করছিল।

বাবলু ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। না এই ঘরের মধ্যে আর ভাল লাগছিল না। একটু ফাঁকা জায়গা দরকার। রজত ! রজত নেই ! একথা ভাবতে গা হিম হয়ে আসছিল।

পুরানো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল বাবলুর। দুজনে একসঙ্গে স্কুলে যাওয়া বিকেলে খেলার মাঠ রথের মেলায় ফুলের গাছ আর টিয়াপাখি কেনা, তেইশে জানুয়ারী ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে মার্চপাস্ট, সব যেন চোখের ওপর ভাসছিল। মাঝে মাঝে রজত বোকা বানাবার জন্যে তোতলা সাজত। সেই তো-তো করা মুখের চেহারা দেখলেই হাসি পেত। ননীস্যারের নিজের কথায় টান আছে। রজতকে তোৎলাতে দেখলেই ননীস্যার রেগে যান। রেগে নীলডাউন করিয়ে দেন বেঞ্চের ওপর।

পিসিমার চোখ এড়িয়ে রাস্তায় নেমে বাবলুর ভাল লাগছিল। লংকাটাও নেই। যাক বাঁচা গেছে ! কী যে এক ফেউয়ের মত লংকাকে পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে ব্রজদা। ভয় সকলেই পায়। তাই বলে এত ঘাবড়ে যাবার কী আছে ?

বাবলু বড় রাস্তা ছেড়ে গলির রাস্তা ধরেছিল। বড় রাস্তায় বড় ভিড়। রিক্সায় রিক্সায় বোঝাই, মোটরের হর্ণ। লোকের চিৎকার চেঁচামেচি। গলিরাস্তা একটু অচেনা হলেও অনেক ভালো। বাবলু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল। গাধার পিঠে ইট যাচ্ছিল কারো বাড়িতে। একটা রামছাগল দাড়ি নাড়তে নাড়তে চলছিল, গলায় ঘণ্টা। টুং টাং টুং টাং ঘণ্টা বাজছিল।

দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এসেছিল। কখনও উঁচু গলি কখনও নিচু। ভাল করে তাকিয়ে হাঁটতে হয়। দু-একবার হোঁচট খেয়েছিল বাবলু। একবার যেন মনে হয়েছিল অন্ধকারে কেউ পিছনে পিছনে

আসছে। আবার মনে হল সাঁৎ করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ছায়ামূর্তি।

বাবলু ঘুরে তাকিয়েছিল। বুকের মধ্যে ধুপধাপ করে উঠেছিল। ভয় পেলেই ভয়, নইলে কী আর! বাবলু এবার মন শক্ত করে রাস্তায় পা ফেলেছিল। ডান দিকের বাঁক ফিরে বাঁয়ে ঘুরলেই রাজা ঘাট। নিচে গঙ্গা।

ঘাটের ওপর এসে বসেছিল বাবলু। গঙ্গার জল কুলকুলু বয়ে যাচ্ছে। ঠণ্ডা বাতাসে গা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। মন হালকা হয়ে আসছিল বাবলুর। জলের ধারে পা ডুবিয়ে দুটো হিপি সাহেব যেন মাথায় গঙ্গার জল ছিটোচ্ছিল। একটা নৌকো বাঁধা ছিল পাড়ে। দূরে মালবিয়া ব্রীজের ওপর একটা ট্রেন যেন গম গম শব্দে চলে গেল।

বাবলু চশমার কাঁচ পুঁছে ভাল করে দেখতে চাইছিল। চলন্ত জলে এক ধরনের আলো ঠিকরে ওঠে। গঙ্গার জল গেরুয়া। তার ওপর ঘাটের আবছা আলো এসে পড়েছে। এতক্ষণে সে দেখতে পেল যে দুজন গঙ্গাজল ছিটোচ্ছিল তাদের একজন হিপোপাটেমাসের মত। আর একজন রোগা লম্বা তালপাতার সেপাই। মাথাভর্তি বড় বড় চুল, মুখ চোখ ঢেকে দিয়েছে। বিচিত্র পোশাক। মোটা লোকটার খালি গা, গায়ে উলকি। রোগা লোকটার গায়ে একটা ঢলঢলে আলখাল্লার মত পোশাক। ওদের দেখে বাবলু নিজের অজান্তেই হেসে উঠেছিল।

মোটা হিপিটা ভুড়ি নাচিয়ে কাছে এসে বলল, ইউ লাফিং মিস্টার? তুমি হাসছো?

বাবলু হাসি চেপে ঘাড় নেড়েছিল, না।

লোকটা নিজে জোরে জোরে হাসল। হেসে বলল, হাসো! হাসো! খুব হাসো। লাফ মাই বয়!

কেন হাসবে? বাবলুর জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়েছিল। এখন তো দুঃখের সময়। রজত নেই। এখন কি কেউ হাসে?

হিপি ছুটো বাবলুর পাশে, সিঁড়ির ওপর।

বাবলু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে ছিল। সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে কোন দেশ থেকে এসেছে এরা। ময়লা নোংরা ছেঁড়া পোশাক। পায়ে জুতো নেই। মাথাভর্তি চুল! কী খায় কোথায় থাকে কে জানে। তবু এরাই যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে দেবদূতের মতো বলছে হাসো! হাসো! লাফ মাই বয়।

কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে কথাবার্তার পর বাবলু বলেছিল, আমি যাই।

হিপিটা বাবলুর হাত ধরেছিল। বলেছিল, কোথায় যাবে বাবু? চল, একটু ঘুরে আসি। বোট আছে। চল। বলেই সে বাবলুকে একটা লজেন্সের মতো কি খেতে দিয়েছিল। অন্যমনস্কের মতো সেটা মুখে পুরতেই মাথা ঘুরে গিয়েছিল বাবলুর। চোখের পলকে সে যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল।

॥ খুঁজে বেড়ানো ॥

এদিকে টুকুন মাথায় হাত দিয়ে বসল।

ভীষণ কান্না পাচ্ছে তার। এ কী হল! এই খারাপ খবরটা সে কী করে মাকে জানাবে? বাবা জানলেও বিপদ। কেন যে সে বাবলুকে বাড়িতে রেখে এসেছিল। আর লংকাটাও তেমনি। লংকা যে এভাবে বাবলুকে একা রেখে বেরিয়ে পড়বে, কে জানত।

নদীর ঘাটের সিঁড়িতে বসে ফকির বলল, ভেবে কী হবে টুকুন যা হবার হয়েছে। এখন ভেঙ্গে পড়লে চলবে না।

কেদার আঙুল দিয়ে গঙ্গার জল নাড়াচ্ছিল। বলল, আমার বুকের মধ্যেও কেমন ঢিপ ঢিপ করছে। বলেই কেদার উঠে দাঁড়াল। টুকুনের হাত টেনে দাঁড় করিয়ে বলল, চল, এখন যেতে হবে। ব্রজদা থানা থেকে ক্লাবে আসবে। রফিকরাও আসছে।

চোখে রুমাল চাপা দিয়ে টুকুন আস্তে আস্তে পা ফেলে বলল, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি যাব না।

কেদার বলল, আরে চল, চল। ভালো খবরও পাওয়া যেতে পারে। হয়ত এর মধ্যে বাবলুর খোঁজ পাওয়া গেছে।

টুকুন ঘাড় নাড়ল, দূর, ভালো খবর থাকলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই চলে আসত।

ফকির বলল, বাবলুটা তো বোকা নয়, তবে সে একা একা বের হল কেন?

টুকুন বলল, কেন আবার। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিস? বাবা যখন রজতের খবরটা বলল তখন কী রকম হয়ে গেল মুখটা।

ফকির বলল, হতে পারে। রজত ওর প্রাণের বন্ধু।

কেদার যেতে যেতে বলল, কিন্তু বাবলুটা গেল কোথায়?

টুকুন উত্তর দিল না। ফকির বলল, যারা এর পিছনে রয়েছে তারা ভীষণ চালাক। একটা দুটো লোকের কাজ নয়। এর পিছনে মস্ত দল আছে।

কেদার মাঝখানে। দুদিকে ফকির আর টুকুন। কেদার দুজনের কাঁধে দু হাত রেখে ভাবল, কী আশ্চর্য। কথায় বলে বিপদ কখনও একা আসে না।

*　　*　　*

ওধারে লংকা নেড়া মাথার চুল ছিঁড়ছিল।

জীবনে এরকম বোকামি করেনি লংকা। বুদ্ধি একটু কম লংকার, সে কথা সে মানে। কিন্তু এমন বোকামি কখনো করে না। রফিক যেতে যেতে বলল, লংকা ওরকম পটাপট মাথার চুল ছিঁড়লে টাক পড়ে যাবে এখুনি।

লংকা লাল চোখে রফিকের দিকে তাকাল। বলল, আরে টাক। মাথা ছিঁড়ে নিলে ঠিক হয়। আমার জন্যে কী বিপদ যে হল।

নান্নু হাসল। বলল, আরে ভাই বিপদ হয় বলেই বিপদের উদ্ধার আছে। রামচন্দ্রজীর বিপদ হল, হনুমানজী আছে। বাবলুর বিপদ, আমরা আছি।

রফিক বলল, তুই নিজেকে হনুমান বলছিস নান্নু ?

লংকা তেড়ে উঠল, রফিক ইয়ারকি করিসনে। এটা হাসিঠাট্টার সময় নয়।

রফিক হাসি থামাল না। বলল, আরে হাসতে হাসতে বিপদের সামনে দাঁড়াতে হয়। রাগ করলে বা চোখের জল ফেললে কী বিপদ কাটবে ?

নান্নু ঘাড় নাড়ল। বলল, ঠিক বলেছিস।

লংকা বলল, আলিমুদ্দিন চাচা ঠিক খবর আনবে তো রফিক ?

রফিক ঘাড় নাড়ল। বলল, নিশ্চয়। চাচা খুব ভাল। লোকের সেবা করতে পেলে কিছু চায় না। আমরা ক্লাবে গিয়ে দেখব চাচা ঠিক গুলু ওস্তাগরকে নিয়ে এসেছে।

নান্নু চোখ ফেরালো। বলল, খবর পাওয়া যাবে বাবলুর ?

রফিক বলল, নিশ্চয়ই। আরে গুলু ওস্তাগর একটা দারুন লোক। ওর কাছে খবর নির্ঘাৎ মিলবে। বাবলু থাকলে, বা ওকে কোথাও পাঠিয়ে দিলে আমরা জানতে পারব।

এক সময় ওরা ক্লাবে পৌঁছে গেল।

*　　　*　　　*

ওধারে ব্রজদা থানায় এসেছিল। এখন সে পাণ্ডের মুখোমুখি বসে আছে। বাবলু আসা ইস্তক, আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা খুলে বলল ব্রজদা। তার আগে বাবলু আর রজতের সেই লরি ধরার গল্পও বলল পাণ্ডেকে। এমনকি বিরজুর ওপর ব্রজদার সন্দেহর কথাও বাদ দিল না ব্রজদা।

পাণ্ডে বলল, ব্রজদা, আমি বাবলুর ব্যাপারটা দেখছি। তুমি ঘাবড়িও না। রাত বারোটা বাজবার আগেই তোমাকে খবর দেব। তুমি রেডি থাকবে।

ব্রজদা ঘাড় নাড়ল। বলল, আচ্ছা। কিন্তু ব্যাপার কী পাণ্ডে ? বাবলুর নিখোঁজ হবার মধ্যে কি বিরজু আছে ?

পাণ্ডে বলল, আরে বিরজু থাকলে সে এমন কিছু না। তুমি যা ভাবছ তা নয়, অন্য ব্যাপার। তোমাকে পরে বলব। আমি খবর পেয়েছি। মনে হচ্ছে একটা মস্তবড় শয়তানের দলকে ধরতে পারব। এখন আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না।

ব্রজদা উঠে পড়ল। তারপর ক্লাবে চলে এল।

ক্লাবে তার জন্য টুকুনরা অপেক্ষা করছিল। ব্রজদা সেখানে এসে চেয়ারে শুয়ে পড়ল।

কেদার টুকুন আর রফিক মাটিতে বসে রয়েছে। নান্নু ফাকির দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লংকা ঘরে আসছে না দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।

ওদেব কাছে ব্রজদা থানায় পাণ্ডের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে বললেন।

এক সময় কার পায়ের শব্দ পেয়ে রফিক লংকাকে জিজ্ঞেস করল, কেউ আসছে রে?

সত্যি কে যেন একজন আসছে। লংকা তাকে চেনে না। যে আসছে সে বুড়ো। চোখের ভুরু পাকা। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুকঠুক করে হাঁটছে। চোখে ভারি গোল চশমা। একদিকে ডাঁটি ভাঙ্গা, সুতো দিয়ে বাঁধা।

লংকা ভিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, কে একজন আসছে এদিকে।

॥ নৌকায় যেতে যেতে ॥

জলে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

বাবলু জেগে না ঘুমিয়ে ঠিক বুঝতে পারছে না। স্বপ্নের মত মনে পড়ছে অদ্ভুত একটা লজেন্সের কথা। সেটা মুখে দিয়ে বাবলুর মাথার মধ্যে কেমন করছিল। আস্তে আস্তে চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল। তারপর মনে হল যেন ভূমিকম্প হচ্ছে।

এখন বাতাস ঠাণ্ডা, গা জুড়িয়ে যাচ্ছে। চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে খুলে গেল। বাবলু প্রথমে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখল। চারদিকে আবছা অন্ধকার। নদীর ওপর নৌকো। দুপাশে দুজন লোক। আর গলুয়ের মধ্যে বাবলু শুয়ে আছে। উঠে বসতে বসতে বাবলু বলল, আমি কোথায়?

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাবলুর সব মনে পড়ে গেল। ওই তো সেই মোটা হিপিটা দাঁড় টানছে। আর রোগাটা হাল ধরে বসে। বাবলুর সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। আচমকা চিৎকার করে উঠল বাবলু, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?

মোটা হিপিটা বলল, বেশি চিট্‌কার করো না। তার গলায় ধমকের সুর।

বাবলু রেগে গেল। রেগে আরও জোরে চিৎকার করে উঠল, কী?

চুপ করে থাকো।

ওদের মুখের চেহারা দেখে বাবলু বুঝল খুব বিপদ।

এই নির্জন নদীতে বাবলু একা। বড় অসহায়। এখানে সুবল-মামা নেই, রজত নেই। ব্রজদা টুকুন কেদার ফকিরও নেই। বাবলুর কোনও জারিজুরি খাটবে না। বেশি চেঁচামেচি করলে হয়ত মাথায় একটা ডাণ্ডা মেরে এখুনি শুইয়ে দেবে আবার।

রাগে দুঃখে বাবলু নিজের হাত কামড়ে ধরল। লংকাকে ফাঁকি দিয়ে একা একা সে গঙ্গার ঘাটে এসে বড় বোকামি করেছে। শুধু বোকামি নয় ভুল। ভুলের ফল তাকে ভুগতেই হবে। তবে ভয়ে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আবার ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা করলেও হবে না। বাবলু জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু দু হাত যেতে না যেতেই এরা জল থেকে টেনে তুলবে। তার চেয়ে বীরের মত বিপদ বরণ করবে বাবলু। হঠাৎ স্কুলের প্রাইজ

ডিষ্ট্রিবিউশনে নিজের সেই আবৃত্তিটা মনে পড়ল বাবলুর। 'বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা। বিপদে আমি না যেন করি ভয়।...'

মনে মনে আবৃত্তি করে বাবলুর অনেক ভাল লাগছিল। জোরে চিৎকার করে বললে, আরও জোর পাওয়া যেত মনে। এতক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে বাবলু। কিন্তু পিসিমার মুখ মনে পড়তেই চোখ ছলছল করতে লাগল। পিসিমা থেকে মা। মা থেকে বাবা। বাবলু ওঁদের কথা ভেবে মনে সাহস আনতে চাইল।

খানিকটা সময় কাটল। তারপর বাবলু উঠে বসল। জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি।

মোটা হিপিটা বলল, বেশি দূর নয়।

আমাকে নিয়ে যাচ্ছ কেন ?

হুকুম।

বাবলু বলল, তোমরা তাহলে হুকুমের চাকর।

মোটা হিপিটা রেগে বলল, চপো।

রাগাতে পেরে বাবলুর আনন্দ হচ্ছিল। বাবলু দুহাতে তালি দিয়ে জোরে জোরে চিৎকার করল, চাকর চাকর ?

মনের রাগ যেন এমনভাবে বুঝিয়ে দিতে চাইছিল বাবলু। কিন্তু তার আগেই নৌকো পাড়ে এসে ঠেকল। নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে হিপোপটেমাস দাঁতে দাঁত ঘষল, নেমে এসো।

অন্ধকারে বাবলু কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। এদিকটা বড় নির্জন। একটা শেয়াল বোধহয় জলের ধারে কাঁকড়া খেতে এসেছিল, হঠাৎ বাধা পেয়ে হুক্কা হুয়া ডাকতে ডাকতে ছুটে পালাল।

খুব সাবধানে মাটিতে পা রাখল বাবলু। পায়ে ভিজে মাটির স্পর্শ! সামনে অনেকটা ফসলের ক্ষেত। ঠিক ক্ষেত কিনা তাও বোঝা যায় না।

চারদিকে অন্ধকার। দূরে, বহুদূরে একটা আবছা আলোর রেখা।

হিপোপটেমাস মুখের সামনে হাত রেখে শব্দ করল, আ-আ-আ-আ- !

ওপার থেকে আওয়াজের উত্তর এল একই সুরে, আ-আ-আ-আ- ।

বাবলুর হাত ধরে হিপিটা বলল, কাম—এসো ।

বাবলু হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল । বলল, ছেড়ে দাও ।

দূরের সেই আলোটা স্পষ্ট হল । অন্ধকারে আলোটা দোলাতে দোলাতে কেউ আসছে ।

এদিকটা কোন দিক ? উত্তর না দক্ষিণ ? বাবলু বুঝতে চেষ্টা করছিল । কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না । নৌকার ভিতর রাগারাগি করা ঠিক হয় নি । বাবলু মনে মনে ভাবল । হিপিটা কোনদিকে বসে দাঁড় টানছে সেটা লক্ষ করলে বাবলু দিক ঠিক করতে পারত। বাবলু আবার ভাবল দিকটা ঠিক করে নেওয়া উচিত ছিল । ভুল হয়ে গেছে ।

আলোটা কাছে এসে পড়েছে । একেবারে মুখের ওপর । বাবলু চোখ বন্ধ করে ফেলল ।

একটু পর চোখে আলোটা সয়ে এল । বাবলু চোখ খুলল । সামনে সাপ দেখলে বাবলু বোধ হয় এত চমকে উঠত না । সেই মুখ সেই চোখ, সেই বিকট চেহারার লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ।

লোকটা বলল, আও বাচ্চা ; এসো ।

বাবলু কী করবে ভেবে পেল না ।

লোকটা এগিয়ে এসে বাবলুর হাত সজোরে চেপে ধরল । বাবলু আঁতকে উঠল ।

।। টুকুনের মা বাবা ।।

টুকুনের মা বসে বসে বাবলুদের কথা ভাবছিলেন ।

ছেলে দুটো কখন বেরিয়েছে । নটা বাজতে চলল, এখনও ফিরছে না । এত দেরী করে না কোন দিন । অবশ্য এখন একটু দেরী

হলেও হতে পারে। টুকুন একদিন বলেছিল ক্লাবের এ্যান্নুয়েল ফাংসন নাকি এগিয়ে আসছে। তাই বলে এত রাত করে বাইরে থাকা ঠিক না। টুকুনের মা মনে মনে ঠিক করলেন আজ একটু বকা-বকি করতে হবে টুকুনদের। একটু ধমক দিতে হবে।

নিচে জোর খেলা চলেছে। টুকুনের বাবা ভোলাবাবু কালীচরণ আর নিতাই খেলছে। কী এক চীনে খেলা। মাঝে মাঝে চিৎকার উঠছে।

টুকুনের মা বাইরে থেকে ঘরে এলেন। বাব্বা! বুড়ো বুড়ো মানুষগুলো এত চিৎকার করতে পারে! হাতের কাজ সারা। ছেলে-গুলো না এলে ভাল লাগছে না। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকালেন টুকুনের মা। উল্টো দিকের দোকানে টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে। দুটো সাইকেল রিকসা ঘন্টি বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

রেডিওটা খোলা রয়েছে। কী একটা গান হচ্ছে। টুকুনের মা রামায়ণখানা তুলে নিলেন। দুহাতে বইটা ধরে কপালে ঠেকালেন একবার, তারপর সুর করে পড়তে শুরু করলেন। 'ইন্দ্র বলে সমাচার না জান পবন। নাগপাশে বাঁধা আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।'

হঠাৎ পায়ের শব্দ, মনে হল কারা যেন আসছে। একসঙ্গে অনেক পায়ের শব্দ হচ্ছে। টুকুনের মা বই মুড়ে বাইরের দিকে তাকালেন। একটু পর টুকুনের গলার আওয়াজ শোনা গেল, মা।

টুকুনের মা বললেন দাঁড়া, আসছি।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে টুকুনের মা দরজা খুলে দিলেন।

দু হাতে মুখ ঢেকে টুকুন বাড়ির মধ্যে ঢুকল। বাইরে কেদার, ফকির, লংকা। একটু দূরে ব্রজদা দাঁড়িয়ে।

ব্রজদাকে দেখে মাথায় ঘোমটা তুলে দিলেন টুকুনের মা। তারপর বললেন, কী হয়েছে তোর, ওরকম করছিস কেন?

টুকুনের সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কথা বলতে পারছে না টুকুন। বলতে গেলে হয়ত কেঁদে ফেলবে।

টুকুনের মা বললেন, হ্যাঁরে, সবাইকে দেখছি। বাবলু কোথায়?

ব্রজদা এগিয়ে এল। টুকুনকে বলল, ভেতরে গিয়ে মেসোমশাইকে ডেকে নিয়ে আয়।

টুকুন ঘাড় নাড়ল। বলল, আমি পারব না ব্রজদা।

টুকুনের মা এর ওর মুখের দিকে চাইলেন। তারপর কিছুই বুঝতে না পেরে বলে উঠলেন, কী ব্যাপার ব্রজ? বাবলু কই?

ব্রজদা এগিয়ে এল। বলল, মাসিমা সেই কথাই আমরা জিজ্ঞাসা করছি। বাবলু ক্লাবে যায় নি। কোথায় গিয়েছে বলতে পারেন?

চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসছে। আচমকা সারা শরীরটা কেঁপে উঠল টুকুনের মার। বললেন, কী বলছিস ব্রজ। বাবলুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

টুকুনের বাবা. ভোলাবাবু, কালীচরণ, নিতাই ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসছিল। টুকুনের মার চিৎকারে সকলেই ছুটে এল। টুকুনের বাবা ব্রজদাকে দেখে বলে উঠলেন. কী ব্যাপার। এত চেঁচামেচি কিসের?

ব্রজদা উত্তর দিল, বাবলুকে পাওয়া যাচ্ছে না মেসোমশাই।

কী বাজে কথা বলছ। পাওয়া যাচ্ছে না মানে?

ক্লাবে যায় নি। কোথায় গিয়েছে আমরা বুঝতে পারছি না। শহরের এপাশ ওপাশ চষে ফেলেছি কিন্তু কোথাও নেই সে।

থানায় গিয়েছ? নিতাই জিজ্ঞেস করল।

গিয়েছি, ডাইরি করে এসেছি।

টুকুন মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। টুকুনের বাবা হতভম্ব। আর সবাই কী যে বলবে ভেবে পাচ্ছে না। টুকুনের মার মাথা টলছে।

ব্রজদা হঠাৎ চিৎকার করল, টুকুন মাকে ধর। এখুনি মাসিমা পড়ে যাবে।

টুকুন কোনরকমে তার মাকে ধরে সামলেছে। কিন্তু তার মা এর মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

জল ; জল। ব্রজদা চিৎকার করে উঠল, পাখা। পাখা নিয়ে আয়।

॥ দুই বন্ধু ॥

সেই যে বিকট চেহারার লোকটা তার হাত ধরেছিল, তারপর কি ভাবে কোথা দিয়ে বাবলু এ ঘরে এসেছে মনে নেই। এখন তার চোখ জলে ভরে গেল !

ছোট বোন নিতুর কথা মনে পড়ছে। দশে পা দিয়েছে নিতু। কিন্তু এখনও ভূতের গল্প শুনলে ভয় পায়, মাকে জড়িয়ে ধরে। কাশী আসবার সময় নিতু বলেছিল, দাদা আমার জন্যে কাঁচের চুড়ি আনবি আর একটা পুতির মালা।

ভারিক্কি চালে বাবলু বলেছিল, আনবরে, আনব। আর কি আনব বল ?

আর কী আনবে ? কিন্তু কিছুই ভাবতে না পেরে মাকে জিজ্ঞেস করল, দাদা আর কী আনবে মা ?

মা হাসতে হাসতে বলেছে, তুই বল না।

নিতু চোখ বড় বড় করেছে। তার আর কিছুই মনে পড়ছিল না।

মা বলেছেন কেন, বেনারসী চমচম।

নিতু লজ্জায় মায়ের কোলে মুখ লুকিয়েছে। মিষ্টি খেতে বড় ভালবাসে নিতু। একবার চুরি করে খেতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল। তখন কী লজ্জা। দি কেস অব দি মিষ্টিরিয়াস সুইটমিট থেপটটা নিতুকে নিয়েই লেখা।

ভাবতে ভাবতে বাবলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এ জীবনে আর নিতুর মুখ দেখা হল না। তার কাঁচের চুড়ি, পুতির

মালা কিছুই নিয়ে যাওয়া হল না বাবলুর। বাবলু চিরকালের মত হারিয়ে গেল। হয়ত নিরুদ্দেশের পাতায় ছোট্ট একটা ফটো ছাপা হবে। তাতে লেখা থাকবে—গত এত তারিখ হইতে শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক হারাইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি সন্ধান দিতে পারিলে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নিতুর কথা থেকে একে একে মা আর বাবার কথা মনে পড়ছে। বাবা বড় ভীতু। একটুকুতেই কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েন। কী করবেন ভেবে পান না বাবা। বাবলুকে কিছুতেই একা ছাড়েন নি। শেষ পর্যন্ত এক দাদু দিদার হাতে দিয়ে তবে শান্তি। কিন্তু এখন? বাবলু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বাবার মুখটা সাদা হয়ে গেছে। মাথার চুল উস্কোখুস্কো।

মার মুখ মনে পড়তেই বাবলুর চোখ দুটো ছলছলে হয়ে এল আবার। মার কথা ভেবে চাপা গলায় বলে উঠল, মা, মাগো—

কিছুক্ষণ আগে বাবলু এখানে এসেছে। নৌকো থেকে নামবার পর সেই ভীষণ চেহারার লোকটা তার হাত ধরে ঝোপঝাড় বনবাদাড়ের ওপর দিয়ে একটা গোরস্থানের মতো জায়গায় নিয়ে এসেছিল। ওপরে ভাঙ্গাচোরা ইটপাথর থাকলেও মাটির নিচে একটা পুরনো আমলের বাড়ি আছে। লোকটা বাবলুকে সেখানে নিয়ে তালা খুলে একটা ঘরে ঠেলে দিয়েছিল। তখন থেকে সে এখানেই আছে

বাবলু গলা চড়িয়ে আবার বলল, মা, মাগো—

হঠাৎ তার মনে হল অন্ধকারে কেউ যেন নড়েচড়ে উঠল। ফিস ফিস করে কেউ বলল, আরেকজন এল। অন্য একজন বলে উঠল, কে কে?

এ ঘরে আসবার পর বাবলু ভাবতেই পারে নি এখানে কেউ আছে। প্রথমটা সে ভয় পেয়ে গেল। তারপর জোর করে মনে

সাহস আনতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

দূরে হঠাৎ বুনো কুকুরের চিৎকার শোনা গেল। বাইরের বনজঙ্গলে হয়তো ঝড় উঠেছে। মরিয়া হয়ে বাবলু চেঁচিয়ে উঠল, আমি বাবলু -বাবলু রায়—

সঙ্গে সঙ্গে ওধার থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল, বাবলু রে, আমি রজত —রজত।

রজত!

বাবলু নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে ভুল শুনছে না তো?

বাবলু— রজত আবার ডাকল। আমি রজত।

মানুষ ভয়ে কাঁদে। দুঃখে কাঁদে। আনন্দেও কাঁদে। বাবলু আর চোখের জল সামলাতে পারল না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে পড়তে বলে উঠল, রজত। তুই কোথায়?

অন্ধকারে রজত হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, এই যে, এখানে।

॥ রাত বারোটা ॥

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

বাইরের দরজায় তিনবার ঠক, ঠক, ঠক শব্দ।

ব্রজদা ইজিচেয়ারে শুয়ে কিছু একটা ভাবছিল। সন্ধে থেকে আজ নানারকম ঝামেলা যাচ্ছে। বাবলুর কথা ভেবে ব্রজদার কষ্ট হচ্ছিল। টিকুনের মার কথা ভেবেও দুঃখ হচ্ছিল ব্রজদার। বেড়াতে এসে ছেলেটার কী বিপদ! আর মাসিমার কথা চিন্তাই করা যায় না। শেষ অবধি ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেল টুকুনের মাকে।

অবশ্য বিপদ এলেই ব্রজদার মাথা খুলে যায়। জীবন মানেই যুদ্ধ। যে সারাজীবন যুদ্ধ করল না, কেবল শুয়েবসেই রইল, ব্রজদা তাকে দুচোখে দেখতে পারে না। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে ব্রজদা

গুনগুন করে গেয়ে উঠল, ব্যাঘাত আসুক নব নব—আঘাত খেয়ে অচল রব, বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক।

টুপি হাতে থানার অফিসার পাণ্ডে ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে একগাল হাসল। বলল, আরে ব্রজদা, তুমি গাইছ।

ব্রজদা হাসল।

পাণ্ডে বলল, কিছু খবর আছে।

খবর তো তোমার কাছে পাণ্ডেজী।

আগে তোমার খবর দাও দাদা। পরে আমারটা শুনবে।

ব্রজদা হাসল। বলল, আগে বল, চা না কফি খাবে ?

কিছু না।

আরে খাও একটু। শুধু মুখে কি কথাবার্তা হয়।

পাণ্ডে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

বেশ খাওয়াও তবে।

ব্রজদা হিটারে জল চাপিয়ে দিল। কাপের মধ্যে দুধ চিনি কফি মিশিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে লাগল। এ বাড়িতে ব্রজদা একা থাকে। ব্রজদার বন্ধুবান্ধব কখনও আসে। কখনও কেদাররা রাত কাটায়, ফিস্টি করে। ক্লাবের যত ঝামেলা ব্রজদাকে সামলাতে হয়।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে পাণ্ডে বলল, দুটো টিকটিকি ছেড়ে দিয়েছি দাদা। আজ রাতের মধ্যেই সব খবর পেয়ে যাব।

বিরজুর কোন খবর পেয়েছ ? ব্রজদা জিজ্ঞেস করল।

বিরজুর খবর নিয়ে কী হবে। বিরজু একটা ক্ষুদে চামচিকে। পাণ্ডে পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসে বলল, বিরজুর চোরাই কারবার আছে। পাটনা, ক্যালকাটা, দিল্লী, বোমবাই থেকে লোক আসে। মাঝে-মধ্যে দুএকটা বড় কাজ যে করে না, তা নয়। বলবন্ত দাসের তিন লাখ টাকার সোনা-চাঁদির গয়নাও ডাকাতি করেছিল। তবে জ্যান্ত লোকজনের কারবার ও করে না। ওতে খুব বিপদ।

পাণ্ডেজী, যে লোক চোরাই জিনিস চালান দেয়, সে ভালমতন টাকা পেলে মানুষ চালান দিতে পারে না কী ?

দেখ ব্রজদা, সে যা কাজ করে তার বাইরে যেতে চায় না। তবে লোভের কথা বলা যায় না।

ব্রজদা হাসল। বলল, লোভে পাপ।

পাণ্ডেজী বলল, পাপে মৃত্যু।

পাণ্ডের কফি খাওয়া হয়ে গিয়েছে। সে বলল, ব্রজদা এবার তোমার খবর বল।

ব্রজদা খাটের এককোণে বসে বলল, পাণ্ডেজী আমার খবর কিন্তু অন্যরকম। বিরজুকে যত সোজা লোক ভাবছ সে তত সোজা লোক নয়। মাঝেমধ্যে লোকজন চালান দেয়।

পাণ্ডে জিজ্ঞেস করল, তার প্রমাণ কী ?

ব্রজদা হাসল। বলল, দিতে পারলে আমি তোমার কাছে যাব কেন ? তবে একটা খবর দিতে পারি। বিরজু বিদেশীদের সঙ্গে খুব মিশছে। বিদেশী মানুষজন খুব যাতায়াত করছে তার কাছে। খুব গোপনে আসে যায়।

তাতে কী প্রমাণ হয় ?

ব্রজদা আর কথা বলল না। হাতে তালি বাজিয়ে ডাকল, ওস্তাগর।

লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে যে মানুষটা ঘরের ভিতর ঢুকল তাকে দেখে পাণ্ডে লাফিয়ে উঠল, আরে এ জেলঘুঘুটাকে তুমি কোত্থেকে ধরলে ব্রজদা ?

ব্রজদা হাসল। বলল, এসে গেল।

পাণ্ডে ওস্তাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তারপর, কী মনে করে ?

ওস্তাগরেব শুকনো মুখটা হাসিতে ভরে গেল। বলল, আপনাদের কাজে লাগব বলে এলাম বাবুজী।

পাণ্ডে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তীক্ষ্ণ চোখে ওস্তাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সত্যি কাজে লাগবে, না মিথ্যে মিথ্যে ঝঞ্ঝাট করবে ?

বাবুজী, আজ বাদে কাল মরে যাব। এখন আর মিথ্যে বলব কেন ?

পাণ্ডে অবাক হয়ে বলল, কী বলতে চাও তুমি ?

ওস্তাগর বলল, বাবুজী, আমি প্রমাণ দিচ্ছি, তারপর আপনি বিচার করে দেখুন !

কিন্তু তুমি কেন প্রমান দেবে ? তোমার প্রাণের ভয় নেই ?

দু চোখ জলে ভরে গেল ওস্তাগরের। বলল, সে বাবুজী আপনি বুঝবেন না। বাপ-মা হারানো ছেলের দুঃখ আমি জানি। বলে থামল ওস্তাগর।

॥ হাত বাড়ালেই বন্ধু ॥

ওদিকে রজতের হাতে হাত পড়তেই বাবলুর কি ভাল যে লাগল

আজ কতদিন বাদে রজতের হাত ধরেছে বাবলু। কতদিন বাদে জড়িয়ে ধরল তাকে : আনন্দে গলার কাছটা বজে আসছে। বাবলু বলল, রজত।

রজত বলল, বাবলু।

তোরা কদিন এখানে আছিস ?

আজ নিয়ে তিন দিন।

তি-ন-দি-ন।

রজত বলল, হ্যাঁ। থ্রি ডেজ। তারপর বলল, যোগিন্দর মোমটা জ্বালো।

ফস করে আলো জ্বলে উঠতেই চোখে যেন ধাঁধাঁ লেগে গেল বাবলুর। আলোটা অস্পষ্ট। ভালো করে মুখ দেখা যায় না।

এত বড় একটা বিরাট হলঘর যে এখানে থাকতে পারে কে জানত। পুরো একটা ব্যাডমিনটনের কোর্ট কেটেও আশপাশে দর্শকদের বসবার জায়গা পড়ে থাকে। ঘরটা বোধ হয় পাথরের। অনেক উচুঁতে দুএকটা ঘুলঘুলির জানালা। সে জানালাতেও পাথবের জাফরি লাগানো।

আলো দেখে কয়েকটা চামচিকে কোথা থেকে উড়ে এল। তারা মাথার ওপর ছোঁ দিয়ে যাচ্ছে। বিচ্ছিরি গন্ধে ঘরটা ভরে আছে। রজত বাবলুর হাত ধরে বলল, আমার নতুন বন্ধুদেব সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দি।—এ হচ্ছে যোগিন্দর সিং আর এ হচ্ছে ওম প্রকাশ ত্রিপাঠী। ওদের বলল, এ আমার পুরোনো বন্ধু বাবলু রায়।

যোগিন্দর হাত বাড়িয়ে দিল, কেমন আছ?

বাবলু হ্যাণ্ডশেক করল। বলল, তুমি কেমন আছ?

ত্রিপাঠী বাবলুর হাত ধরে বলল, ভাল কি করে থাকি বল।

বাবলু হাসল!

বাতি নিভে আসছিল। সামান্যই একটু বাতি। এ বাতি রজতদের জ্বালাবার জন্য নিশ্চয়ই দেয়নি কেউ। আরও হয়ত কোন হতভাগ্যের দল এখানে ছিল। তাদের ফেলে যাওয়া টুকটাকি জিনিস-পত্তোর থেকে এ বাতি আর দেশলাই বেরিয়েছে। বাবলুর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

কিরে ফোঁস করছিস কেন? দুঃখ হচ্ছে?

দুঃখ কিসের। বাবলু বলল, তবে কী জানিস এমনভাবে হারিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কেউ তৈরি ছিলাম না। বুকের মধ্যে তাই কেমন একটা কষ্ট হচ্ছে।

রজত শান্ত গলায় বলল, কষ্ট হবার কথাই।

আমরা এখানে পচে মরব।

পচে মরবার জন্যে আমরা কেউ জন্মাইনি। রজত দাঁতে দাঁত ঘষল। বলল, শেষ চেষ্টা না করে আমরা ছাড়ছি না।

শেষ পর্যন্ত আমরা লড়ব। যোগিন্দর জোরের সঙ্গে বলল।

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, ত্রিপাঠী চেঁচিয়ে উঠল।

চারজন হাতে হাতে দিয়ে গলা মিলিয়ে চিৎকার করে উঠল, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

চিৎকারের শেষে সবাই কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে আসছিল। বাতিটা নিভু নিভু। ঘরের অন্ধকার চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে। আর কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বিন্দুমাত্র আলো থাকবে না। তখন কেউ কারও মুখ দেখতে পাবে না।

যোগিন্দর বলল, এরপর কী করা দরকার ?

দেখা যাক। রজত বলল।

বাবলু কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তার কেমন যেন ভয় ভয় করছে। তবু সে নিজেকে সাহস দিতে চাইল, কিসের ভয় ?

রজত হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তুই কুকুরের ডাক শুনেছিস ?

বাবলু বলল, আমি যখন আসি তখন মনে হচ্ছিল দূরে কোথায় ডাকছে।

আলোটা নিভে গেল আচমকা। এখন ঘরে ধোঁয়া আর মোমের গন্ধ।

রজত বলল, ওই কুকুরগুলো আর বাইরে থাকবে না। মনে হচ্ছে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়বে এবার।

বাবলু বলল, তোরা কুকুরগুলো দেখেছিস ?

রজত বলল. দেখি নি। তবে মনে হচ্ছে ওরা খুব কাছেই আছে। একটা দুটো নয় পাল পাল কুকুর।

বাবলু ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছিল। একটু ভেবে সে বলল, আচ্ছা কুকুরগুলো কখন ডাকে রে ?

যোগিন্দর বলে উঠল, দশটার সময়।

বাবলু রজতকে জিজ্ঞেস করল, ডাকার সময় ঘড়ি দেখেছিস ?

রজত অন্ধকারে ঘাড় নাড়ল, না।

বাবলু আবার কী চিন্তা করল। তারপর বলল, ছাখ আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে একটা কারসাজি আছে। যারা আমাদের ধরে এনেছে তারা হয়ত আমাদের ভয় দেখাতে চায়।

যোগিন্দর ওদের কথা শুনছিল। সে এবার বলে উঠল, ঠিক বলেছ বাবলু, কুকুরগুলো খানিকক্ষণ পর পরই ডেকে ওঠে।

ত্রিপাঠী জিজ্ঞেস করল, তুমি ঠিক জানো?

রজতের আগেই কথাটা মনে হয়েছিল। কুকুরগুলোর ডাকের মধ্যে একটা মিল আছে। তা ছাড়া মোটামুটি একই ভাবে ডেকে উঠেছে। সে চিন্তা করতে লাগল।

যোগিন্দর ত্রিপাঠীকে বলল, হ্যাঁ।

বাবলু কী বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই কানের কাছে হঠাৎ কুকুর ডেকে উঠল। সে চমকে গেল। ঘাড়ের ওপর গরম নিশ্বাস পড়ছে। চারপাশে অনেক চোখ জ্বলছে যেন। হ্যা হ্যা করে যেন জিভ নাড়ছে কতকগুলো কুকুর।

॥ কলকাতার খবর ॥

শ্রীপতিবাবু অফিস যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। আজ কদিন ধরে অফিসে খুব কাজ। একদিন যে বিশ্রাম নেবেন তার জো নেই।

নিতু পুতুলেব বিয়ে দেবে বলে পুতুল সাজাচ্ছে। ছুটকির ছেলেব সঙ্গে নিতুর মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। এখনও হাজার রকমের কাজ বাকি নিতুর। নিমন্ত্রণ করা হয়নি। বিয়ে বাড়ির অর্ধেক জিনিস-পত্তর আসেনি। নিতুর বন্ধু ছানু সকাল সকাল আসবে বলেছিল, ছানুটাও এখনও এল না। নিতু ব্যাজার মুখে গজগজ করে উঠল, আর পারি না বাপু। আমাকেই সব দিক সামলাতে হবে।

রান্নাঘর থেকে মা চিৎকার করলেন. নিতু তোর বাবার খাবার জলের গেলাসটা নিয়ে যাস। পানটাও নিয়ে যাস।

তুমি নিয়ে এস আমি এখন পুতুল সাজাচ্ছি।

হতভাগা মেয়ে কাজের সময় খেলা! নিতুর মা রেগে উঠেছেন, যা বলছি শোন। নইলে টান মেরে ফেলে দেব সব।

নিতুর কান্না পাচ্ছিল। মা কিছু বোঝে না। মুখ ভার করে সে উঠে পড়ল। তারপর জলের গেলাস এনে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। শ্রীপতিবাবু মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। জল খেলেন। একটা পান তুলে মুখে পুরতে পুরতে বললেন, বিয়ে বাড়ির মিষ্টি লাগবে না? কই মিষ্টি আনতে বললে না তো।

মা-র শাড়ি ভাজ দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরেছে নিতু। আঁচলে অঙুল জড়িয়ে পাকা গিন্নির মত। ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে নিতু বলল, আমার একটা টাকা আছে।—এক টাকার মিষ্টি আনবো।

দূর এক টাকার মিষ্টিতে কী বিয়েবাড়ির ভোজ হয়। আমি তোমার জন্য পাঁচ টাকার সন্দেশ নিয়ে আসব।

নিতুর চোখ গোল গোল হয়ে এল।—পাঁচ টাকার। সে যে অনেক মিষ্টি। কিন্তু সন্দেশ ভাল নয়, সন্দেশ শুকনো শুকনো। নিতু হাসিতে গলে গিয়ে বলল. সন্দেশ নয় বাপি পানতুয়া এনো।

—বাইরে থেকে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মা বলে উঠলেন, নিতু আবার জ্বালাচ্ছিস। খালি বায়না।

শ্রীপতিবাবু বললেন, নিতু চেয়েছে নাকি—আমি বলেছি মিষ্টি এনে দেব।

নিতু চলে যাচ্ছিল। শ্রীপতিবাবু বলে উঠলেন, নিতু তোমার পুতুলমেয়ের বিয়ে। দাদাকে নেমন্তন্নের চিঠি পাঠিয়েছ?

নিতু ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

কি লিখেছ?

চোখ চকচক করে উঠল নিতুর, ওয়ান ফর সরো, টু ফর জয়। দাদা আমার মেয়ের বিয়ে, তুমি এসো নিশ্চয়।

শ্রীপতিবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

নিতু খেলতে চলে গেল। শ্রীপতিবাবু জুতো পায়ে দিতে দিতে নিতুর মাকে বললেন, তুমি রজতের খবর জানতে চাইছিলে তখন, যাবে নাকি খবর আনতে ?

চল যাই। নিতুর মা তাড়াতাড়ি শাড়ি বদলে নিলেন। সত্যি কি দিনকাল হল। হুট করে একটা ছেলে চোখের সামনে দিয়ে উবে গেল, আজ সাতদিনের ওপর তার কোন খোঁজ-খবর নেই। নিতুর মা জুতো পরতে পরতে বলে উঠলেন, রজতের মা তো শয্যাশায়ী। ওর বাবার দিকেও তাকানো যায় না। ক'দিনেই কেমন পাগল পাগল হয়ে উঠেছেন।

হবে না। অমন ছেলে।

আমার এক এক সময় বাবলুটার জন্যে ভয় হয়। যা ছেলে।

শ্রীপতিবাবু সাহস দিলেন। বললেন, ভয় করে আর কি করবে বল। বিপদ এলে তায় মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

বাবা-মা চলে যেতেই নিতু দরজা বন্ধ করে, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। ক-টা চড়ুই কিচিরমিচির করে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা হলদে রংয়ের প্রজাপতিও। কুঁজো মতন একজন লোক, পিঠের ওপর নোংরা থলে নিয়ে রাস্তার ময়লা কাগজ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। পুরানো একটা কথা মনে করে নিতু হেসে ফেলল। কে যেন বলেছিল, ওরা ছেলেধরা। ছোট ছোট ছেলে ধরে, তারপর বেড়ালছানার মত থলেয় পুরে নিয়ে যায়।

চিচিং ফাঁক ! চিচিং ফাঁক !

নিতু হঠাৎ চমকে উঠল। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ভুতের মত কে একজন চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক বলে চেঁচাচ্ছে। নিতু খুব ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে দেখতে গেল। দেখে সুবলমামা। কী বিচ্ছিরি সেজেছে মামা। মাথায় বাঁদুরে টুপি, পায়ে গামবুট। গায়ে আলখাল্লা, পরনে ঢোলা প্যান্ট। মুখময় খোঁচাখোঁচা দাড়ি।

কতদিন যেন দাড়ি কামায়নি মামা, নিতু দরজা খুলতে খুলতে বলল, কী বিশ্রী সেজেছ মামা, একদম বাজে।

হুঁ হুঁ। গলার মধ্যে অদ্ভুত শব্দ করে সুবলমামা হাসল। বলল, সেজেছি কী আর সাধে, বুঝলি না ঝামেলায় পড়ে সেজেছি। এক বেটা খুনে-ডাকাত রোজ নাকের ডগা দিয়ে পালাচ্ছিল। আজ আর যাবে কোথায় বাছাধন। এক্কেবারে হাতে হাতকড়া দিয়ে, গারদে পুরে, তবে আসছি।

খুনে-ডাকাত শুনেই রজতদার কথা মনে পড়ে গেল নিতুর। নিতু চোখ গোল্লা গোল্লা করে বলল, জানো মামা, রজতদাকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছে।

সুবলমামা চোখ কপালে তুলল। বলল, কোন রজতকে? বাবলুর বন্ধু?

নিতু ঘাড় নাড়ল।

ইস। আমাকে একবার খবর দিসনি। হতভাগা গুণ্ডার যা অবস্থা করে দিতাম।

তোমাকে পাবে কোথায়? তুমি তো সব সময় চোর-ডাকাত ধরে ধরে বেড়াচ্ছ! বাড়ি থাক কখন?

তা যা বলেছিস। সুবলমামা চেয়ারে বসতে গেল। বলল, আমার কি আর এক মিনিট ফুরসৎ আছে।

এই সময় বাইরে দরজার কড়া নড়ে উঠল। টেলিগ্রাম পীওন এসেছে।

টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে সুবলমামা পড়তে সুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো কপালে উঠে গেল তার—এ-কি দেখছে সুবলমামা, এ কী! ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ল সুবলমামা। বাবলু নেই। বাবলু মিসিং।···

॥ শেষ চেষ্টা ॥

রাতটা কোন রকমে কেটে গেল।

সারারাত ছুচোখের পাতা এক করা যায়নি। একটু বুজতে না বুজতেই ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা ধরে কুকুরের চিৎকার, পেটে খিদে, মনে ভয়। তার ওপর পোকামাকড় আর চামচিকের উৎপাত। পাথরের ঘর বলে শীত লাগছিল।

ঘরের মধ্যে একটা আবছা আলো। এ আলোটা কোথা থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। এসব পোড়ো ভুতুড়ে বাড়িতে, কোথা দিয়ে কী হয় বোঝা যায় না। রাতে কেমন যেন একবার মনে হয়েছিল, যে কারা যেন হেঁটে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। ফিসফিস করে কথা বলছে। নিশ্বাসের বাতাস ঘাড়ে মাথায় এসে পড়ছে।

রজত জিজ্ঞেস করল, বাবলু খিদে পেয়েছে ?

বাবলু ছু-হাতে পেট চেপে ধরল। বলল, খুব।

ওমপ্রকাশ মেঝের ধুলোয় শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। বলল, না খেলে মরে যাব।

বাইরে বোধহয় সকাল হয়েছে। আকাশে সূর্য উঠেছে। রজত বলল, এ-সময়ে সকালে বেলফুল ফোটে। আমার টবের গাছটাতে কুঁড়ি এসেছিল দেখেছিলাম।

বাবলু হাসল। বলল, তোর গাছটা কবে মরে গেছে রে। তুই নেই। তোর গাছে কে আর জল দেবে।

রজত বলল, যা বলেছিস। তারপর মুখ নিচু করে বলল, মার মুখটা মনে পড়লে আমার কান্না পায় রে বাবলু।

আমার পায় না ? মাকে কতদিন দেখিনি।

তবে ?

তবে আর কী। এখানে আমরা পচে মরতে পারি না। এখান থেকে বেরুবার জন্য আমাদের শেষবারের মত একবার চেষ্টা করতেই হবে।

ওমপ্রকাশ আর যোগিন্দর পাশে এসে বসল। যোগিন্দর বলল, নিশ্চয়ই।

হঠাৎ যেন খিদে আর তেষ্টার কথা ভুলে গেল বাবলুরা। সারা রাত্রির কষ্ট এক নিমেষে ঝেড়ে ফেলে সবাই উঠে দাঁড়াল! পাতালের এই ঘরে তিলে তিলে মরার চেয়ে কিছু একটা করে মরা ভালো। যোগিন্দর আর ওমপ্রকাশ দরজার দিকে গেল। বাবলু আর রজত দেওয়ালের দিকে দেখতে শুরু করল।

দরজাটাও কি ভারী আর প্রকাণ্ড। বিশাল এক পুরানো কাঠের তৈরি। তার ওপর লোহার পাত বসানো। বার বার টানাটানি করে একচুল নড়ানো গেল না ওটাকে। ওমপ্রকাশ হতাশ হয়ে ধুলোর ওপর বসল। যোগিন্দর দরজা থেকে হাত সরিয়ে নিল। খোলা যাবে না।

রজত দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। এ দুদিনে এটা কারো চোখে পড়েনি। জাফরির পাশ দিয়ে অশ্বত্থ গাছের একটা ঝুরি নেমেছে। একটু উঁচুতে উঠলেই হাত পাওয়া যায়। শক্ত মোটা ঝুরি, চেষ্টা করলে বোধ হয় ঝুলে থাকা যাবে। রজত চেঁচিয়ে বলল, যোগিন্দর ওম এদিকে আয়।

ওরা চলে আসতে সবাই মিলে ভাল করে দেখতে লাগল। হ্যা, চেষ্টা করা দরকার। হয়ত ওপরের ওই ঘুলঘুলির জাফরিটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। তেমন জোরে ঠেলা দিলে খুলে যেতে পারে। বাবলু বলল, এখানেই কাজ শুরু করতে হবে।

যোগিন্দর মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে শুয়ে পড়ল। তার পিঠের ওপর বসল ওমপ্রকাশ। রজত বাবলুর হাত ধরে ওমপ্রকাশের কাঁধে দাঁড়াল। একটা হাত দেওয়ালে রেখেছে রজত, আর এক হাতে অশ্বত্থের ঝুড়িটা ধরেছে। বাবলু বলল, ওমপ্রকাশ দেওয়াল ধরে ধরে আস্তে আস্তে ওঠ। আমি ধরে আছি।

যোগিন্দর দাঁতে দাঁত চেপে আছে। ওমপ্রকাশের চোখ লাল

হয়ে উঠেছে। রজত হঠাৎ পা তুলে নিয়ে ঝুলে পড়লো। জাফরিটা নাগালের মধ্যে এসে গেছে '

পাথরের দেয়ালে পাথরের জাফরি। কতকালের কে জানে। রজত ঝুরি ধরে ঝুলতে ঝুলতে পা তুলে শরীরটাকে গুটিয়ে নিল। তারপর সজোরে লাথি মারল।

ওমপ্রকাশ বলল, ভেরি গুড।

যোগিন্দর বলল, ট্রাই এগেন। আবার মারো।

রজত আবার মারল। সামান্য যেন শব্দ হল। কপালে ঘাম, রজত চোখে অন্ধকার দেখছে। এভাবে ঝুলতে ঝুলতে আর লাথি মারতে মারতে হাত আর পা অবশ হয়ে আসছিল।

বাবলু বলে উঠল, রজত আর একবার।

প্রাণপণে রজত শেষবারের মত আঘাত করল। তারপর গড়িয়ে পড়ল।

এদিকে জাফরিটা কাত হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে অনেকখানি আলো। যোগিন্দর তাকিয়ে দেখে সাবাস দিল।

ওমপ্রকাশ বলল, এর পর আমি লাথি মারছি।

বাবলু বলল, তোমাকে কাঁধে করবে কে ?

এই সময় বাইরের দরজাটা হঠাৎ নড়ে উঠল। কারা যেন এদিকে আসছে। তাড়াতাড়ি বাবলুরা চারজন জড়াজড়ি করে বসে পড়ল। একটা লোক ঘরের মধ্যে খাবার এনে খোনা গলায় হেসে উঠল, মিছিমিছি কষ্ট করছ খোকাবাবুরা। আজ রাতেই আমরা এখান থেকে চলে যাব। তার চেয়ে বরং খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। গায়ে জোর পাবে।

॥ রহস্যের খোঁজে ॥

কেদার আর ফকির বিছানায় বসে আছে। নান্নু আর রফিক চেয়ারে। লংকা মাটিতে শুয়ে আছে। টুকুন জানালা দিয়ে বাইরের

দিকে তাকিয়ে ছিল। ব্রজদা ঘরময় পায়চারি করছে। কেমন যেন অস্থির দেখাচ্ছে ব্রজদাকে। সারা রাত ঘুমোয়নি ব্রজদা, তার চোখ লাল লাল।

কেদার হঠাৎ বলল, ব্রজদা গুলু কী বলেছে?

ব্রজদা বলল, ও যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, তবে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো। এর মধ্যে একটা বিরাট দল আছে। তারা কী চায় জানি না।

ফকির আমতা আমতা করছিল। বলল, আমরা গুলুর কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি কি ব্রজদা?

ব্রজদা বলল, আমার তো মনে হয় গুলু সত্যি কথাই বলছে। মিথ্যে বলে ওর কী লাভ?

রফিক সামনের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, ব্রজদা, তুমি ঠিক বলেছ। ও আর বিরজুর কথামতো চলবে না।

নান্নু নস্যির ডিবে ব্রজদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি যাই বল ব্রজদা, বিরজুর দারুণ বুদ্ধি। আমাদের কী রকম বোকা বানালো। চোখের সামনে দিয়ে বাবলুবাবুকে উঠিয়ে নিয়ে গেল, আমরা কেউ কিছু করতে পারলাম না।

ঠক ঠক ঠক মাটিতে তিনবার মাথা ঠুকলো লংকা। এত জোরে শব্দ হল, সবাই চমকে উঠল। অন্য কেউ হলে মাথা ফেটে রক্তগঙ্গা বয়ে যেত, লংকার মাথা বলে কপালটা ফুলে উঠল একটু। লংকা বলল, তুই থাম নান্নু, বাহাদুরি করিসনে। আমার বোকামির জন্যে উঠিয়ে নিয়ে গেল, নইলে কেমন নিয়ে যেত দেখতাম।

লংকার চোখ লাল। মুখ কাঁদো কাঁদো। ব্রজদার কেমন যেন মায়া হল। লংকার মত গোঁয়ার ছেলের যদি এরকম অবস্থা হয়, তবে অন্য ছেলের কী হবে! ব্রজদা লংকার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, তোর দোষ কী লংকা। যা ঘটবার ঘটেছে। এখন ওদের উদ্ধার করবার রাস্তাটা বের করতে হবে।

টুকুন বলল, হবে, হবে, হবে। তখন থেকে শুধু হবে হবেই শুনছি। হচ্ছে কই ?

ঘরের সবাই হকচকিয়ে গেল। টুকুন কখনও এত জোরে চিৎকার করে কথা বলে না। ফকির টুকুনের কথায় সায় দিয়ে বলল, ঠিক। টুকুন ঠিক বলেছে ব্রজদা।

কেদার বলে উঠল, আমাদেরও আর সহ্য হচ্ছে না ব্রজদা। কিছু একটা করবার জন্যে হাত নিশপিশ করছে।

রফিক বলল, শয়তানের মাথাটা দুহাতে ছিড়ে আনলে তবে শান্তি পেতাম।

ব্রজদা ওদের দিকে তাকাল। তাকিয়ে হাসল। এই সময় বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ব্রজদা মুখ ফিরিয়ে বলল, লংকা দেখ তো শিউদাস এল কী না ?

বিকেল পড়ে এসেছে। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া। আর একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। লংকা মুখ ফেরাতে না ফেরাতেই শিউদাস ঘরের মধ্যে ঢুকল।

ব্রজদা বলল, শিউদাস তোমার সবচেয়ে বড়ো নৌকোটা আমাদের চাই।

ঠিক আছে বাবু।

দুজন শক্ত মাঝি দিতে হবে শিউদাস।

আমি আর আমার ছেলে যাব।

তুমি বুড়ো হয়ে গেছ মাঝি, অন্য কাউকে দাও।

রাম রাম। সীতারাম। শিউদাস হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, একবার পাঞ্জা ধরেন বাবু। কে বুড়ো হয়েছে দেখা যাবে।

ব্রজদা হেসে উঠল। বলল, মাঝি, আমরা যে কাজে যাচ্ছি তাতে বিপদ আছে।

শিউদাস একগাল হাসল। বলল, বাবু আপনি বিপদে যেতে পারেন আর আমি পারি না! কী যে বলেন বাবু।

ব্রজদা শিউদাসের পিঠ চাপড়ে দিল। বলল, তাহলে আমরা সাতটার ভেতর আসছি।

শিউদাস চলে গেল।

ব্রজদার মুখ শক্ত হয়ে আসছিল। কেদার, ফকির, টুকুন, রফিক, নান্নু, লংকা সবাই তাকিয়ে আছে। ব্রজদা পকেট থেকে একবার রিভালবারটা বের করল। খুলে দেখল, আবার পকেটে রাখল। তারপর বলল, কেদার আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা শয়তানের ডেরা। এ কাজে বিপদ আছে। তোরা ভাল করে ভেবে দেখ, সবাই যাবি কি যাবি না।

কেদারের মুখ করুণ হয়ে আসছিল। সে বলল, তুমি কী বলছ ব্রজদা। তোমার কথার মাথামুণ্ডু বোঝা যাচ্ছে না। যাব কী যাব না মানে ?

বাকি সকলে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, নিশ্চয় যাব।

ব্রজদা হাসল। বলল, আমি জানতাম। তবুঁ একবার বিপদের কথাটা মনে করিয়ে দিলাম তোদের! আমি জানি, আমি তোদের মাথা হতে পারি, তবু তোরাই আমার হাত-পা শরীর।

লংকা তড়াক করে একটা ডিগবাজি খেল। সকলে হেসে উঠল।

টুকুনের কাঁধে হাত রেখে ব্রজদা বলল, টুকুন ভাবিসনে। বাবলুকে আমরা ছিনিয়ে আনবই।

।। শয়তানের হাসি ।।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না।

ঘরটা অন্ধকার হয়ে আসছে। দিনের আলো নিভে এলে কেমন করে সন্ধ্যে হয়, আঁধার নামে, এসব কোন দিন দেখেনি বাবলু। আজ কেউ যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। বাবলু ভাঙ্গা জাফরিটার দিকে তাকিয়ে সকালবেলার কথা ভাবছিল। এত

পরিশ্রমের পর ধরা পড়ে গেলে কারও ভাল লাগে! সেই লোকটা যে রুটিগুলো দিয়ে গিয়েছিল তা খেতে ইচ্ছে করছিল না। বাবলু হতাশভাবে একটা পোড়া রুটি টুকুরো টুকরো করে মাটির উপর ছড়াচ্ছিল।

রজত তখন বলেছিল, কী করছিস বাবলু! খাবি না?

বাবলু বলেছিল, খেতে ইচ্ছে করছে না।

না খেয়ে কী করবি বল। খেয়ে নে।

ওমপ্রকাশ, যোগিন্দর সবাই শুকনো রুটি চিবোচ্ছিল।

ওমপ্রকাশ বলল, শরীরে জোর রাখতে গেলে খেতে হবে বাবলুবাবু।

যোগিন্দরও ঘাড় নেড়ে বলল, ইয়েস তোমাকে খেতেই হবে বাবলু।

বাবলুর রাগ হচ্ছিল। বলির আগে পশুকে ফলমূল খাওয়ানো হয়। পশুটা খুশী মনেই সে খাবার খায়, জানে না অল্প পরেই খাঁড়ার কোপ পড়বে ঘাড়ে। বাবলু রেগে বলেছিল, খেয়ে কী হবে? আবার তো আমাদের এখান থেকে সরিয়ে দেবে। কোথায় যাব কে জানে।

রজত হেসেছিল। বলেছিল অত ভেঙ্গে পড়লে চলে। বাবলু, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। একবার হেডমাষ্টার মশায়ের পিঠ-চাপড়ানির কথাটা মনে করে দেখ। সেই ক্লাসে ঘোরানো, সেই ইস্কুল ফাটিয়ে চিৎকার করে তিনি বলেছিলেন, আমি এদের জন্যে গর্ববোধ করছি।

বাবলু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। চশমা খুলে চোখ দুটো মুছে বলেছিল, যা বলেছিস। সত্যি সেদিন কী আনন্দ আর উৎসাহ যে পেয়েছিলাম।

এখন কী তোর সব উৎসাহ ফুরিয়ে গিয়েছে?

না, তা নয়। তবে কী জানিস, এক-একসময় কেমন যেন খারাপ লাগে। মনে হয়, ঠিক এতোটা বিপদের জন্য যেন তৈরি ছিলাম না।

বিপদের জন্যে কেউ তৈরি থাকে না বাবলু। বিপদ আসে। তখন তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।

হঠাৎ রবিঠাকুরের সেই কবিতাটা মনে পড়ে গিয়েছিল বাবলুর : 'বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

তারপর আর কোন কথা হয়নি। বাবলু খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছিল। ওমপ্রকাশ, যোগিন্দরও শুয়েছিল। রজত কিছুক্ষণ হাতের ফোস্কায় ফুঁ দিয়েছে, তারপর রজতও শুয়ে পড়েছে।

ভাঙ্গা জাফরিটা দিয়ে দিনের আলো একটু একটু বেড়েছে, আবার ধীরে ধীরে কমে আসছে। এক সময় বাবলু উঠে বসেছিল। একে একে রজত, ওমপ্রকাশ, যোগিন্দরও উঠেছিল। এবার অন্য কোথাও যেতে হবে। কোথায় কে জানে!

বাবলু জাফরির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একটুকরো ভাঙ্গা ইট খুঁজতে লাগল। ওমপ্রকাশ জিজ্ঞেস করল, কী খুঁজছ বাবলুবাবু?

দেওয়ালে নাম লিখব। ইট কি খোলামকুচি খুঁজছি।

কিছু একটা করতে পেয়ে সবাই কেমন যেন উল্লাসিত হয়ে উঠল। কোথাও বেড়াতে গেলে লোকে দল বেঁধে নাম লেখে। পাহাড়ে মন্দিরে। এখানকার এই মৃত্যু পুরীতেও তাদের নাম লেখা থাকবে। যোগিন্দর একটা ভাঙ্গা ভাঁড়ের টুকরো পেয়ে বলল, এই নাও বাবলু।

বাবলু পাথরের উপর আঁচড় দিল। বাঃ, বেশ ফুটছে। তারপর বড় বড় করে লিখল···বাবলু রায়···রজত বসু···যোগিন্দর সিং··· ওমপ্রকাশ ত্রিপাঠী।

ভেরি গুড। যোগিন্দর বলল।

প্রমাণ থাকল। রজত হাসল।

বাইরে হঠাৎ কড়া নাড়ার আওয়াজ। কারা যেন দরজা খুলছে।

বাবলুরা তাকিয়ে দেখল এক দুই তিন। তিন মূর্তি ঘরের ভিতর। একজনের মাথা নেড়া, লম্বা চওড়া তাগড়া চেহারা। পরনে দামী স্যুট। গালের ওপর মস্ত একটা কাটা দাগ। অন্যজনের মাথায় নীল পাগড়ী। মুখে বসন্তের দাগ। আরেকজন গুণ্ডা মতন লোক, হাতে হাতকড়া।

নেড়ামাথা লোকটা বলল, হাতকড়া লাগাও রাম সিং।

- পাগড়ীঅলা লোকটা অন্য লোকটাকে নিয়ে একে একে হাতকড়া পরিয়ে দিল। বাবলুর ইচ্ছে করছিল অন্তত একবার ঝাঁপিয়ে পড়ে টুটি কামড়ে ধরে ওদের। কিন্তু সবাই যখন চুপ করে তখন আর নিজে একা সে কী করতে পারে?

কেদার ফকির টুকুনের কথা মনে পড়ছিল বাবলুর। কেদার বলেছিল. মা গঙ্গার বুকে তোর সঙ্গে ভাব হয়েছে বাবলু। তোর বিপদ আমাদের বিপদ।

বাবলুর চোখে জল এসে যাচ্ছিল।

নেড়া মাথা লোকটা গম্ভীর গলায় বলল, রাম সিং এদের বড় বাড়ির লাল গারদে পুরে রাখ! সাইরেন না বাজা অবধি লঞ্চ ছাড়বে না। তারপর হাসল লোকটা।—বাবলুদের বন্ধুরা সব আসবে আজ। তাঁরা আমাদের অতিথি। একসঙ্গে দশ বারোজনকে পাঠাতে পারলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। বলেই হঠাৎ কেমন যেন হেসে উঠল লোকটা।

বাবলুর মনে হল এ হাসি কোন মানুষের নয়। এ হাসি শয়তানের হাসি। কানে আঙুল দিল বাবলু। তারপরেই চমকে উঠল। কী বলল লোকটা? আরও আসবে কেউ কেউ।

॥ বিরজুর আবির্ভাব ॥

নৌকোটা কিনারে লাগাতেই শিউদাস লাফিয়ে নামল। সামান্য কাদা জল, নিচে নরম বালিমাটি! পা টিপে টিপে নৌকোটা

অল্প এগিয়ে নিয়ে নিয়ে শিউদাস চাপা গলায় বলল, সামাল। হোঁসিয়ার।

চমকে তাকাল গুলু।

ব্রজদা নেমে পড়ে হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, গুলু নেমে এস।

কেদার ফকির নান্নু রফিক লংকা টুকুন সবাই নেমে পড়েছে। কেদারের পিঠে এয়ার গান, রফিকের হাতে গুপ্তি। পুরানো ভোজালিটাকে ধার দিয়ে ঝক ঝকে করে কোমরে গুজেছে নান্নু। ফকিরের হাতে চেনঅলা বেল্ট, টুকুনের হাতে মস্ত একটা টর্চ। কেবল লংকা তার হাতের মুঠো বন্ধ করে একবার ঘুষি পাকাচ্ছিল আবার খুলছিল।

বনে প্রান্তরে কোথাও বোধহয় আকাশের চোরা আলো থাকে। চোখ সয়ে আসতেই অন্ধকার ঠিক অন্ধকার লাগছিল না। পায়ে চলা সরু পথের চিহ্ন। গুলু, আগে আগে ব্রজদা পকেটে হাত রেখে হাঁটছিল। বলল, টুকুন আমি বললে টর্চ জ্বালবে।

টুকুন ঘাড় নেড়ে বলল, আচ্ছা।

পায়ে পায়ে সামান্য শব্দ উঠছে। সকলেই অতি সাবধানী হতে গিয়ে কেমন যেন অসতর্ক হয়ে পড়ছে। লংকা নিজের ভুলে একবার জোরে হেঁচে উঠল। ব্রজদা চাপা গলায় বলল, আস্তে।

মাটিতে একধরনের লতানো গাছ আছে এখানে, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়। দূরে কোথাও একটা আলো জ্বলছে। আলোটা লালচে আভার মতো। হঠাৎ পাশ দিয়ে একটা শিয়াল ছুটে গেল। টুকুন চমকে বাঁ হাতে লংকার কলার চেপে ধরল।

কেদার দূরে আলো দেখে বলল, ব্রজদা, ওটা কিসের আলো।

যেতে যেতেই ব্রজদা উত্তর দিল, জানি না। তবে গাড়ির আলোর মতো লাগছে।

এদিকে গাড়ি আসবার রাস্তা আছে?

গুলু উত্তর দিল, পিপলগড় অবধি আছে। তারপর শুধু গোরুর গাড়ি আর মোষের গাড়ি যায়।

আমরা কোথায় যাচ্ছি গুলু? ব্রজদা জিজ্ঞেস করল।

আমরা পিপলগড়ের পোড়ো মহালে যাচ্ছি। লোকে বলে পুরী আর দৈত্যের মহাল। জায়গাটা উঁচু ঢিবির মতন। বনবাঁদড় আর শেয়ালের জায়গা। একদিন ওখানে একটা মস্ত বাড়ি ছিল। এখন সেটা মাটিতে মিশে গিয়েছে।

ওর ভিতর এখনও অনেক ঘর-দুয়ার, সুড়ঙ্গ আছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, যে জানে সে জানে।

ব্রজদা জোরে জোরে পা ফেলল। বলল, গুলু আরও জোরে পা চালাও। দেরী হয়ে যাবে।

ডান পাশে একটা বাঁক, সামনে উঁচু ঢিবির মত দেখা যাচ্ছে।

গুলু বলল, আমরা এসে গেছি। সামনের বাঁক পার হলেই বিরজুর জায়গা, জীন-পরীর মহাল বাবুজী।

ব্রজদা সেফটি ক্যাচটা টেনে রিভলবারটা হাতের মুঠোয় ধরল। কেদার এয়ার গান নামিয়ে নিল। রফিক গুপ্তির বোতাম টিপে অন্ধকারেই একবার পরখ করল, সাপের জিবের লুকানো ছোরাটা বের হয়ে আসে কি না। নান্নু ভোজালীর ওপর ডান হাতের মুঠো পাকিয়ে ধরল। ফকির বেলটের ঘর আলগা করে নিল। লংকা ঘুষি পাকিয়ে দু হাতের মুঠো শক্ত করেছে। টুকুন টর্চের বোতামে আঙুল রাখল।

বাঁক পার হয়ে সামনে আসতেই, হঠাৎ যেন আলোয় আলো হয়ে গেল সব। ব্রজদা চোখ বুজেই আবার চোখ খুলল। জীপগাড়ির স্পটলাইট জোরে জ্বলে উঠেছে। লম্বা তাগড়া মতন একজন লোক, নেড়ামাথা, সুট-বুট পরে সামনে দাঁড়িয়ে। গালে বিরাট একটা কাটা দাগ। আলো জ্বলবার সঙ্গেই লোকটা ঠা-ঠা করে হেসে উঠল। তারপর ব্যঙ্গের স্বরে বলল, আসুন, আসুন। আসতে আজ্ঞা হোক।

সামনে সাপ দেখার মতো গুলু লাফিয়ে উঠল, বিরজু!

বিরজু তখনও হাসছিল। হাসি থামিয়ে গুলুকে দেখিয়ে বিরজু

বলে উঠল, আরে ব্রজবাবু, রাস্তার এই কুত্তাটাকে কোথা থেকে পাকড়ালেন ? আমার মহাল দেখতে আপনার ইচ্ছা হয়েছে, এ কথাটা একবার বললেই তো হত। আমি আপনাকে নিজে ঘুরিয়ে দেখাতাম। জীন-পরীর মহাল! রাতে বুনো কুত্তা ডাকে, বড়া মজাদার মহাল বাবুজী!

ব্রজদা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। দাঁতে দাঁত চেপে আছে। কেদার ফকির, নান্নু, রফিক, টুকুন, লংকা সবাই থ। গুলুটা কেমন যেন ভুত দেখার মতো ভয়ে ভয়ে দেখছে। ব্রজদা একবার গুলুকে দেখল, তারপর বিরজুর দিকে তাকাল। বলল, খবর আমি পাঠিয়েছিলাম বিরজু। তুমি ছিলে না।

বিরজু আবার হেসে উঠল। বলল, কী যে বলেন ব্রজবাবু। দুটো ছোকরাকে পাঠিয়েছিলেন। একজন বাঁদর নিয়ে গিয়েছিল, আর একজন দাড়িটাড়ি লাগিয়ে। কোনটাই কাজের না।

ব্রজদা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই বিরজু দুহাত দুলিয়ে বলে উঠল, আসুন ব্রজবাবু।—রাম সিং আলো নিয়ে এসো।

॥ জলে-স্থলে ॥

পাণ্ডে ঘড়ির দিকে তাকালো।

নটা বেজে দশ। লঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীণ লাগাল পাণ্ডে। ব্রজদা আগেই তার সেভেন ষ্টার ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছে।

সব খবর পেয়েছে পাণ্ডে। কেদারঘাট থেকে শিউদাসের নৌকা করে ওরা গিয়েছে। অবশ্য এ কাজ তাদের করা উচিত হয় নি। তবু দু-চারজন সাদা পোশাকের পুলিশকে পাণ্ডে ব্রজদাদের পেছনে যেতে বলেছে। বিপদ হলে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিপদ না হলে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। নিজে জল-পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা করে লঞ্চে এসে উঠেছে। পাণ্ডের যা খবর তা যদি সত্যি হয়, তাহলে এই

গুণ্ডার দলটা মির্জাপুরের দিকে পালাতে পারে। মির্জাপুর থেকে বিহার ঘুরে নেপাল হয়ে বাইরে কোথাও চলে যাবে।

ডাঙ্গার দিক থেকে এতক্ষণ একটা আওয়াজ আসা উচিত ছিল। তেমন কোন কিছু হলে আকাশের দিকে পরপর তিনবার ফায়ার করতে বলেছে পাণ্ডে। এ নিশানা শোনা যাবে নিশ্চয়।

লঞ্চটা চলছেই না। খুব ধীর গতিতে জলের ওপর ভেসে আছে। যাতে বেশি আওয়াজ না হয়, তার জন্যে সবরকমের বন্দোবস্ত আছে। পাখিকে আর উড়তে দিলে চলবে না। এবার হাতেনাতে ধরতে হবে।

মুখের সিগারেটটা জুতো দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিল পাণ্ডে। অবশ্য বিরজু, যে এ দলের পাণ্ডা সে বিষয়ে এখনও যথেষ্ট সন্দেহ আছে পাণ্ডের। ব্রজদার হিসেব মত কী গুলুর কথা মানতে গেলে বিরজুকেই দলের নেতা বলে মানতে হয়। কিন্তু তাও কি সম্ভব?

সঙ্গে চারটে রাইফেলধারী। নিজের কাছেও রিভলবার। খুব বেশী হলে দু-একটা গুলী ছুড়তে হবে হয়ত। তবে বিরজু থাকলে অন্য কথা। সে মরিয়া হলে লোক খুন করতে পারে। নিজের প্রাণের পরোয়া করে না বিরজু। হাজারবাগের ডাকাতির সময় বিরজু ছাদের পর ছাদ টপকে পালিয়েছিল। তিনতলার ছাদ থেকে গলিতে লাফ মেরেছে। প্রমাণ ছিল না। তাই বিরজুকে ধরা যায়নি, কিছু করাও যায়নি।

পাণ্ডে ডাকল, সীতারাম।

জী।

দূরবীণটা সীতারামের হাতে দিয়ে পাণ্ডে বলল, দেখ। ব্রজদার জন্য ভাবনা হচ্ছিল পাণ্ডের। বিরজুর মত একটা হিংস্র বাঘের গুহায় এরকমভাবে যাওয়া ঠিক হয়নি ব্রজদার।

*　　　*　　　*

ওদিকে রাম সিং আগে আগে। বিরজু তারপর। বিরজুর

পাশাপাশি হাঁটছে ব্রজদা। পিছনে কেদাররা, গুলু একদম শেষে। তার পায়ের পাতা পড়ছিল না। সে যেন ভয়েই কাঁটা হয়ে আছে।

ভাঙ্গা দেউড়ির খিলান পেরিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকল বিরজু। আলো ফেলে, বলল, দেখুন ব্রজবাবু আপনার কোন বন্ধু আছে কিনা। ব্রজদা চারিদিক তাকিয়ে দেখল। তারপর ঘাড় নাড়ল, না।

বিরজু বলল, তবে!

ব্রজদা হাসল। বলল, বিরজু সাহেব, এখানে মাটির নিচে একটা ঘর আছে তোমার। আমি সেটা দেখতে চাই।

কেউ কোন কথা কইছে না। সবাই ফিসফিস করে নিশ্বাস নিচ্ছে। পায়ের চলনেও যাতে শব্দ না হয় দেখছে। কেদার, ফকির, নান্নু রফিক এক-একবার চোখাচোখি করছে। টুকুন ব্রজদার দিকে তাকিয়ে। লংকা কেবল ঘামছিল। রাগে ঘামছিল।

সে খবরও জানেন আপনি! বিরজু আবার হেসে উঠল। নির্জন এ প্রেতপুরী হঠাৎ হাসিতে কেমন যেন 'গমগমিয়ে উঠল। বিরজুর হাসি থেমে গেলেও সে হাসি থামতে চায় না। পুরানো কতকালের জং-ধরা ভাঙ্গা ইট-কাঠ পাথরের দেওয়ালগুলো সেই হাসিতে যেন ভেঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে।

ব্রজদা বলল, হাসি থামাও বিরজু। বাতাসে হাসির প্রতিধ্বনি তুলে বিরজু ব্যঙ্গের গলায় বলল, জী।

আলোটা হঠাৎ নিচের দিকে বাঁক নিল। ব্রজদা তাকিয়ে দেখল, সামনে চার ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ির সামনে একটা দরজা। দরজাটা খুলে ফেলল রাম সিং।

বিরজুর সঙ্গে একে একে ভিতরে ঢুকল ব্রজদারা। ঘরে এত ধুলো যে পা ডুবে যায়। লম্বা ময়াল সাপের লেজের মত অশ্বথের ঝুরি নেমেছে। কেউ বা কারা এখানে ছিল যেন। ধুলোর ওপর পায়ের ছাপ, জুতোর চিহ্ন। দেওয়ালে তাকিয়ে ব্রজদা কিছু একটা দেখছিল। দেশলায়ের কাঠি, পোড়া রুটির মত কিছু যেন পড়ে আছে মাটিতে।

আচমকা কানের ওপর হাজার কুকুর ডেকে উঠল। দুরন্ত হিংস্র বন্য কুকুর। এখুনি যেন লাফিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে, টুকরো টুকরো করে দেবে। বুকের মধ্যে কেঁপে উঠছে। টুকুন একটা ঢোক গিললো।

ব্রজদা চমকে ঘুরে তাকাতে গেল। ততক্ষণে আলো নিভেছে। অন্ধকারে একটা আর্ত চিৎকার—খুন। বিরজুর হাসিটা এখনও বাজছে। ব্রজদা চিৎকার করে বলে উঠল, টুকুন টর্চ।

হ্যাণ্ডস আপ। বিরজুর গলা রুক্ষ, কঠোর। হাত তুলুন ব্রজবাবু।

বিরজুর দুহাতে দুটো রিভলবার। রাম সিংও পিস্তল তুলে ধরেছে। দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে বিরজু। পায়ের নিচে গুলু, একটা পা গুলুর পেটে। বিরজু জোরে জোরে গুলুর পেটে চাপ দিচ্ছিল। আর বলছিল, বন্ধুকে খুঁজুন ব্রজবাবু। বিরজু ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠল, আমি যাচ্ছি। আলোটা নেভাও খোকাবাবু।

ব্রজদা পাথরের মত। কেদারের দাঁতে দাঁত। ফকির শূন্য চোখে তাকিয়ে। নান্নু রফিক স্থির। আলো নেভাতে ভুলে গেছে টুকুন। লংকা পিঠ বেঁকিয়ে গুড়ি মেরে দাঁড়িয়ে।

আলো নেভাও। আবার কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করল বিরজু। গুড নাইট।

অন্ধকার হতে না হতেই আচমকা স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে পড়ল লংকা! তবেরে শালা। এতক্ষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে সে যেন এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে কেদার এয়ার গানের কুঁদোটা দরজার ওপর আছড়ে মারল। রফিক গুপ্তির বোতাম টিপে লকলকে ছোরার জিবটা দরজা তাক করে চালাল। একটা গুলির শব্দ। কে যেন কাতর গলায় চিৎকার করে উঠল। সব ছাপিয়ে লংকার সরু রিনরিনে গলা তীক্ষ্ণ হুইসিলের মত বেজে উঠল, আলো জ্বালা টুকুন—আলো। রিভলবারটা হাতে চেপে ব্রজদা বলল, স্টপ ইট বিরজু—স্টপ—তোমার খেলা শেষ হয়েছে।

ওধারে পরপর তিনবার গুলির শব্দ হতেই পাণ্ডে ঘুরে দাঁড়াল। না, জলে কেউ নেই। সে চেঁচিয়ে উঠল, তীরের দিকে লঞ্চ ভেড়াও।

জলে ঢেউ নেই। বাতাসে অল্প অল্প কাঁপছে। পাণ্ডে রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল। কপালে কয়েকটা কুঞ্চন। সীতারাম হঠাৎ বলে উঠল, সাব ওয়ারলেস। খবর আছে। জবর খবর।

পাণ্ডে জিজ্ঞেস করল, কী?

ওদের খোঁজ পাওয়া গেছে। ওপরের পুরনো মহালে আছে।

পাণ্ডে এবার চেঁচিয়ে উঠল, লঞ্চটা শিগগির পাড়ে নিয়ে চল।

॥ উপসংহার ॥

ক্লাবের সামনে এসে কেদার শেষবারের মত মাইকে বলল, বন্ধুগণ আগামী শনিবার প্রখ্যাত সেভেন ষ্টার ক্লাবের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যগণ কর্তৃক অভিনীত নাটকের নাম স্বাতি তারার আলো। রচনা ও পরিচালনা ব্রজদাস সেনশর্মা।

রবীন্দ্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করবেন কলকাতার কিশোর শিল্পী বাবলু রায়। ভাংড়া নৃত্যে যোগিন্দর সিং। কমিকে রজত বসু এবং মূকাভিনয়ে ওমপ্রকাশ ত্রিপঠী। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন টিকিট সংগ্রহ করুন। বন্ধুগণ···বন্ধুগণ···।

ব্রজদা ইজিচেয়ারে বসে আছে। রফিক আর নান্নু মহড়া দিচ্ছিল। ফকির টিকিটে ছাপ মারছে। রজত, টুকুন, যোগিন্দর, ওমপ্রকাশ মেঝের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে। লংকা চেয়ারে বসে আছে। বাঁ হাত সিলিং-এ ঝোলানো তার। মুখখানা একটু শুকনো। ডান হাতে এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ।

ব্রজদা উঠে বসল। তারপর লংকা আর কী খাবি।

লংকা বলল, কী খাওয়াবে?

যা খেতে চাইবি।

পঞ্চুর দোকান থেকে তাহলে খানচারেক চিংড়ির কাটলেট, আর একটা ডিমের ডেভিল আনিয়ে দাও। এ ক'দিন হাসপাতালে একেবারে না খাইয়ে খাইয়ে মেরে ফেলেছে আমাকে।

ব্রজদা হাসল। বলল, টুকুন, আমার নাম করে পঞ্চুর দোকান থেকে লংকার খাবারগুলো নিয়ে আয়।

বাবলু কেদার ঘরে ঢুকছিল। ওরা বলল, আমরা বাদ যাব ব্রজদা?

ফকিরও সায় দিয়ে বলল, এক যাত্রার পৃথক ফল ঠিক নয়।

ব্রজদা হাসতে হাসতে বলল, টুকুন আর সকলের জন্যে এক-একটা কাটলেট। আমার জন্যে একটা ডবল-হাফ চা বলিস।

বাইরে জুতোর আওয়াজ। কেউ যেন মসমসিয়ে আসছে। ব্রজদা ঘাড় তুলে দেখবার আগেই পাণ্ডে ঘরে ঢুকে বলল, ব্রজদা সবাই কাটলেট খাবে আমার বেলা ফক্কা?

একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে ব্রজদা বলল, আরে কী যে বল পাণ্ডেজী। টুকুন পাণ্ডেজীর জন্য চা আর কেক আনবি।

পাণ্ডেজী বসতে সবাই চুপ করে গেল। সে দিনের সেই ঘটনার পর আজ পাণ্ডেজী প্রথম এল ক্লাবে। নিশ্চয়ই কোন খবর আছে। ব্রজদা বলল, বিরজু কিছু কবুল করেছে?

পাণ্ডে একটা সিগারেট ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, নিহিগিরি-পোস্পেহ্যাকের নাম শুনেছ ব্রজদা?

ব্রজদা থতমত খেয়ে বলল, সেটা কী।

নিহিগিরিপোস্পে হ্যাক। অর্থাৎ নিউ হিউম্যান গিনিপিগ রিসার্চ প্রোগ্রাম ফর স্পেস হ্যাবিটেশন এণ্ড কনট্রোল।

ব্রজদা আশ্চর্য হয়ে বলল, না তো।

ঘরের মধ্যে সবাই চুপ। পাণ্ডেজী খুব ধীর গলায় বলল, মানুষের জন্য দুঃখ হয় দাদা। এই মানুষই শয়তান। দেখ, একদিকে মানুষ নতুন নতুন রিসার্চ করছে, গ্রহ গ্রহান্তরে যাবার চেষ্টা করছে, আবার একদল মানুষ বিজ্ঞানের এইসব নতুন সুযোগ নিয়ে নিজের নিজের মতলব

হাসিল করার চেষ্টা করছে। তাদের নতুন রাজ্য চাই। এ পৃথিবীতে যদি নাই হয়, তবে ক্ষতি কী। মহাকাশ তো পড়েই আছে দাদা।

ব্রজদা আকাশ থেকে পড়ল, সে কী।

বিজ্ঞানীদের হাতের মুঠোয় পুরে কেউ মহাকাশ দখল করতে চাইছে। দখল করলেই তো চলবে না। লোক না থাকলে রাজ্য কী? সেখানে নিজের লোক পাঠাতে হবে। অনেক লোক পাঠিয়ে মহাকাশের যত জায়গা দখল কবা যায়।

সবাই অবাক। ব্রজদা বলল, কিন্তু এসব করতে তো অনেক লোকজন আর কোটি কোটি টাকার দরকার।

পাণ্ডে হেসে হেসে বলল, ব্রজদা সব জুটে যায়।

ব্রজদা বলল, তোমার কথা মানছি। কিন্তু মানুষ নিয়ে এ রকম পরীক্ষা করতে গিয়ে সুবিধামতো একটা জায়গা দরকার। সে জায়গাটা ছোট হলে চলবে না, আবার গোপন রাখাতেও হবে।

পাণ্ডে বলল, তোমার সব কথার উত্তর দিতে পারব না ব্রজদা। তবে যা বলছি সব সত্যি। একদল লোক পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একটা গুপ্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ছেলে তাদের হাতে ধরা পড়ছে। নতুন মহাকাশ ছিনিয়ে নিয়ে সেখানকার বসতির জন্য মানুষ চাই—সেই মানুষ তারা খুঁজছে দাদা।

ঘরের ভেতর সবাই চুপ। একটা ছুঁচ পড়লে শব্দ শোনা যাবে। বাবলুরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। ব্রজদা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু বিরজুর সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কী?

পাণ্ডে হাসল, লোভের সম্পর্ক! টাকার জন্য এসব করছে বিরজু। ওর টাকা চাই।

ব্রজদা বলে উঠল, কিন্তু বিরজু এত ঝুঁকি নিতে গেল কেন? এমনি তো অনেক সাধারণ ছেলে রাস্তায় পাওয়া যায়। তাদের ছেড়ে বড় ঘরের ছেলেদের ধরতে গেল কেন? এতে তো দারুণ বিপদ।

সেই তো কথা দাদা। রাস্তার সাধারণ ছেলে চাই না অসাধারণ চাই বলতে পারব না। হয়তো যাকে তাকে হলে ওদের চলবে না।

এই সময় টুকুন ঘরে এসে ঢুকল। তার সঙ্গে কে একটি লোক। তার মাথার বাঁদুরে টুপি। গায়ে আলখাল্লা। পরণে ঢোলা প্যাণ্ট, পায়ে গামবুট। টুকুন খাবার-টাবার নামিয়ে রাখলো। রাখতে রাখতে চিৎকার করে উঠল, বাবলু কে এসেছে ত্থাখ—

বাবলু অবাক হয়ে তাকাল, সুবলমামা।

ব্রজদা এবং পাণ্ডে তুজনেই সবিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল। এই গরমে একি পোশাক!

সুবলমামা ব্রজদার দিকে তাকিয়ে বলল, হিমালয় থেকে কলকাতায় আসছিলাম। আর কলকাতায় এসেই টুকুনের বাবার টেলিগ্রাম পেয়েই ছুটে এসেছি। জামা-কাপড়গুলো ছাড়বার আর সময় পাইনি। তারপর হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করে আবার বলল, আপনাদের ধন্যবাদ মশাই, খুব বাঁচান বাঁচিয়েছেন। যা খিদে পেয়েছে কি বলব। টুকুনের হাতে খাবার-দাবার দেখে প্রাণে জল এল।

ব্রজদা হেসে বলল, আরে বসুন বসুন—। পাণ্ডেজী চা-টা খান।

হ্যা, খেয়েদেয়ে তারপর সব শুনব। সুবলমামা বলল।

ব্রজদা বললেন, সুবলমামাকে খেতে দে-রে —

একটা প্লেটে কাটলেট-টাটলেট সাজিয়ে সুবলমামার সামনে দিল টুকুন। সুবলমামা তক্ষুনি খাবারগুলো আক্রমন করল।

মাথা চুলকোল বাবলু। একটা কথা জিজ্ঞেস করব পাণ্ডে সাহেব?

পাণ্ডে ঘাড় নাড়ল।

আচ্ছা, আমরা যে অত কুকুরের ডাক শুনতাম, সে কুকুরগুলো কী সত্যি ছিল বিরজুর?

পাণ্ডে হাসল। হেসে বলল, না ওটা টেপ করা। কুকুরের ডাক তাদের নিশ্বাসের শাদ, হ্যা হ্যা ভাব সব টেপে ধরে সময়মত বাজাত বিরজুর লোক। পুরনো ভুতুড়ে বাড়িতে ও ডাক বীভৎস হয়ে উঠত।

ব্রজদা বলল, স্ট্রেঞ্জ। এত ব্রেন থাকতে বিরজু বিপথে গেল।

পাণ্ডে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কী আর করবে ব্রজদা, এরকমই হয়। হয়ত এই-ই দুনিয়ার নিয়ম। কার নসীবে কী আছে কে জানে। একটু থামল পাণ্ডে তারপর বলল, সবই হল। বদমাইশগুলো ধরা পড়ল, শুধু কষ্ট হয় গুলুটার জন্য।

ব্রজদা আস্তে করে মাথা নাড়াল। তার মুখ গভীর দুঃখে ভরে গেছে। সে বলল, হ্যাঁ।

গোটা ঘরটায় বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল। সবাই চুপচাপ। শুধু যোগিন্দর বলল, আমাদের জন্যই গুলু প্রাণটা দিল।

রফিক বলল, গুলুর জন্য কিছু একটা করা দরকার।

ব্রজদা সেই কথাই বোধ হয় ভাবছিল। বলল, আমাদের ক্লাব থেকেই কিছু একটা করব।

সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কী করবে ব্রজদা?

তক্ষুনি উত্তর দিল না ব্রজদা। অল্পক্ষণ চিন্তা করে বলল, আমাদের এই বেনারসে যে সব ছেলে নিজের বিপদ জেনেও অন্যের উপকার করবে প্রত্যেক বছর তাদের একজনকে বেছে নিয়ে আমরা তার এক বছরের পড়ার খরচ চালাব। গুলুর নামে ওই বৃত্তিটা দেওয়া হবে।

পাণ্ডে বলল, ভেরি গুড।

আর সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, এর চাইতে ভাল কিছু হয় না।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর পাণ্ডে হঠাৎ লংকার দিকে তাকাল। তাকিয়ে হাসল। তারপর ব্রজদার দিকে ঘুরে বলল, একটা সুখবর আছে ব্রজদা—

ব্রজদা বলল, কী?

ব্রজদা, লংকা একটা পুরস্কার পাবে। সাহসের জন্য সরকার এই পুরস্কারটা দেবেন লংকাকে। আমাদের থানার তরফ থেকে আমরাও একটা মেডেল দেব। দুর্দান্ত কাজ করেছে লংকা।

ব্রজদা বলল, চমৎকার।

অন্য সকলেও চেঁচিয়ে উঠল, দারুণ দারুণ—

রফিক বলল, ক্লাব থেকে লংকার জন্য কিছু করা হবে না?

ব্রজদা বলল, একটু ভেবে দেখি। তবে সবার যখন ইচ্ছা তখ লংকার জন্য নিশ্চয়ই কিছু একটা করা হবে। একটু চুপ করে থেে আবার বলল, মনে মনে আমি অবশ্য একটা কথা ভেবে রেখেছি।

কী?

লংকাকে আমাদের বার্ষিক ফাংশনের সময় সম্বর্ধনা দেওয়া হবে।

লংকা জিজ্ঞেস করল, সম্বর্ধনা টম্বর্ধনা না হয় হল। আসল জিনিসটা থাকবে তো?

আসল জিনিস বলতে?

ভুরি ভোজ।

ব্রজদা এবং সেই সঙ্গে আর সবাই হো হো করে হেসে উঠল তারপর ব্রজদা বলল, নিশ্চয়ই। ভুরি ভোজ ছাড়া কোন কিছু হয় নাকি?

পাণ্ডে চায়ে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, বার্ষিব উৎসবের তো এখনও কয়েকদিন দেরি। আজ কিছু একটা হবে না।

কী করতে চাও?

পাণ্ডে এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, অন্তত একটা গানটানও তে হতে পারে।

ব্রজদা বলল, নিশ্চয়ই পারে। বলেই বাবলুর দিক তাকাল বাবলু টুকুনের দিকে। তারপর সকলে সমস্বরে গেয়ে উঠল, 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য কর—'

সুবল মামা এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি। খুব মনোযোগ দিয়ে কাটলেট খেয়ে যাচ্ছিলেন। গান শেষ হতেই হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, তোমরা সবাই পুণ্য কর। আর আমি? আমি এটা পূর্ণ করি।
